সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গন

শ্রীসন্তোষ কুমার দাশ গুপ্ত

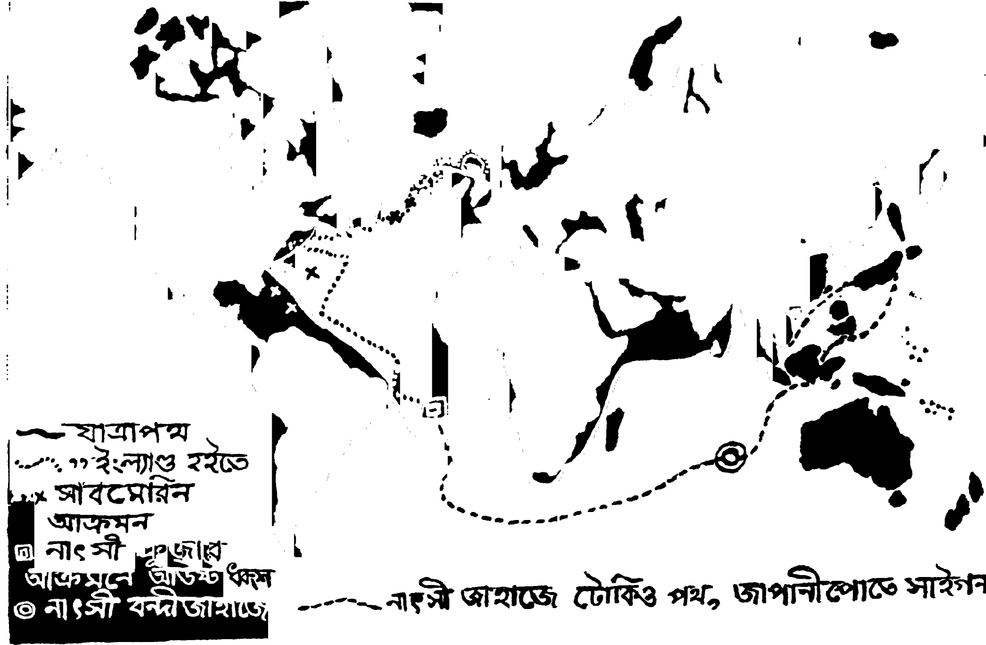
দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত
১৪৯বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা।

প্রথম মুদ্রণ
১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৩।

শ্রীশচীন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট
হইতে মুদ্রিত।

প্রথম পর্ব


যাত্রাপথ
„ ইংল্যাণ্ড হইতে
সাবমেরিন
আক্রমন
নাৎসী বন্দীজাহাজে
নাৎসী জাহাজে টোকিও পথ, জাপানীপোতে সাইগন

অ্যাটলাণ্টিক রণাঙ্গনের পথে

১৯৪১ সাল, মে মাস; রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ তখনও সুরু হয় নাই। নাৎসী জার্ম্মাণী মিত্রপক্ষকে বৃটেনের দ্বীপগুলিতে ঘিরে রেখেছে। রণাঙ্গন ব'লে বাস্তবিক কিছু নাই, রুশ ও ছোট দু' একটি দেশ বাদে সমগ্র য়ুরোপ নাৎসী কবলিত। মিত্রপক্ষীয় জাতিগুলির মনে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার মত একটা যুদ্ধক্ষেত্র নাই! আছে কেবল ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় বিমান বাহিনীর আকাশ পথে য়ুরোপের এখানে ওখানে কিছু বোমা নিক্ষেপ এবং বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের তারই বিশদ বর্ণনা। আজ অমুক জায়গায় ১০০০ টন বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কাল ওখানে ৫০০ টন্ —এবং একখানা বা আধখানা বিমান ছাড়া আর সকলগুলিই নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ!

আর ছিল—অ্যাটলাণ্টিক যুদ্ধের কথা। অ্যাটলাণ্টিক যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় নাবিকগণের সাহস, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী। সংবাদপত্রে তখন যুদ্ধের কথা পরিবেশন করবার কিছু নাই, যা আছে তাতে জাতির মনে উৎসাহ আসতে পারে না, আসে নৈরাশ্য, অবসাদ।

জার্ম্মাণী স্থির করল, ইংল্যাণ্ডের রক্তপ্রবাহের ধমনীগুলি ছিন্ন ক'রে তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ ক'রে দিতে। ভারতবর্ষ থেকে, আমেরিকা থেকে, উপনিবেশগুলি থেকে এবং নিরপেক্ষ দেশগুলি থেকে খাদ্য ও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের যে সকল সামগ্রী অ্যাটলাণ্টিক ধমনী দিয়ে ইংল্যাণ্ডে আসছে, সেগুলো যেন ইংল্যাণ্ডে না পৌঁছুতে পারে, সমুদ্র গর্ভেই চিরসমাধি হয়।

ভূমধ্য সাগর বা ইংল্যাণ্ডের প্রধান ধমনী পথে জীবন-রক্ষার জন্য যে রক্ত-চলাচলের গতি তা' আগেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অম্লজানবায়ু ফুস্‌ফুসে আর স্বাভাবিক ভাবে যেতে পাচ্ছে না—ইংল্যাণ্ডকে সেদিন কৃত্রিম উপায়ে অম্লজান গ্রহণ করতে হচ্ছে। সামান্য কিছু গিয়ে পৌঁছুবে—জীবনের শিখা যদি আরও কিছুক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে পারা যায়। যদি ইতিমধ্যে বল-দর্পিত শত্রু কোন ভুল ক'রে বসে, যদি রুষিয়া-জার্ম্মাণীর সাময়িক চুক্তি পোল্যাণ্ড বণ্টনের ব্যাপার নিয়ে কোন প্রকারে ফেঁসে যায়, যদি অ্যাটলাণ্টিকের পরপারে আত্মনির্ভরশীল প্রভুত সম্পদশালী আমেরিকার জনমত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধের জন্য গড়ে তুলতে পারেন এবং অবশেষে বিচিত্র রণসম্ভারে প্রস্তুত হ'য়ে এসে অস্ত্রসংখ্যাবলে জার্ম্মাণীকে অভিভূত করে পতনোন্মুখ ইংল্যাণ্ডকে শেষ নিশ্বাসের সময় তুলে ধরতে পারেন!

জার্ম্মাণীতে সাবমেরিন প্রস্তুতের কারখানাগুলি পূর্ণোদ্যমে চলছে। সাবমেরিনের নাবিকদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অপূর্ব্ব পদ্ধতিতে সাবমেরিন-গুলিতে দক্ষ নাবিক যুগিয়ে যাচ্ছে।

সমুদ্রবক্ষে কোনপ্রকার বাণিজ্য জাহাজই জার্ম্মাণী দেখতে প্রস্তুত নয়, নিরপেক্ষ জাতিদেরও না। নানা উপায়ে রসদ গিয়ে শত্রুর দেশে পৌঁছুতে পারে। জীবন মৃত্যুর এ যুদ্ধে যদি তাদের জাহাজ ও নাবিক বাঁচাতে চায় তো লঙ্গর ক'রে রাখুক আপন আপন বন্দরে!

শত শত সাবমেরিন মৃত্যুদুতের মত সমুদ্রের কোথায় যে আছে জানা নাই। বিশাল সমুদ্রবক্ষ দিয়ে একখানি বাণিজ্যপোত হয়তো চলেছে—ছ'দিন, চারদিন বা দশদিন কোথাও কিছু নেই—অকস্মাৎ প্রবল বিস্ফোরণ! জনচক্ষুর অন্তরালে সমুদ্রের কোন দূর-প্রান্তে নাবিকগণের সঙ্গে জাহাজখানির অতল-জল সমাধি! একটু পরে কোন চিহ্নই নাই;

কতগুলি মানুষ যে একটু আগেও হয়ত গৃহের কথা ভাবছিল তার কোন নিশানাই নাই। আদি সৃষ্টি থেকে কোটী কোটী ঘটনা যেমন সমুদ্র তার গর্ভে ধারণ করেছে তেমনি এই ক্ষুদ্র ঘটনাও নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করল। জলরাশির কল্লোল যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল।

দূরে, বহুদূরে, মাটীর ওপর হয়তো মানুষ তখন আনন্দ করছে, কোলাহল করছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করছে।

শত শত জাহাজ এমনি করে ইংল্যাণ্ডের শ্বাসরোধের অবস্থা উন্মোচন করবার প্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র নাবিক নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে—লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপি জলরাশির ঠিক কোথায়, কবে, কখন, কেমন ক'রে মানুষগুলির কি হ'ল তার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় না।

এ'তে রণক্ষেত্রের উত্তেজনা নাই, তার গৌরব নাই, আছে বন্দর থেকে বেরিয়ে অন্য বন্দরে না পৌছান পর্য্যন্ত প্রতিটি সেকেণ্ডে গুপ্ত আক্রমণের আশঙ্কা এবং হয়তো অনন্ত সমুদ্রবক্ষে শেষে একদিন অতি ভীষণ কষ্টকর মৃত্যু!

জার্ম্মাণ সাবমেরিন বহরের এই গুপ্ত আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে অ্যাটলাণ্টিক বক্ষ বেয়ে বাণিজ্য জাহাজগুলির ইংল্যাণ্ডে যাতায়াতের প্রচেষ্টা—এরই নাম সেদিন দেওয়া হ'ল 'অ্যাটলাণ্টিকের যুদ্ধ'।

কলকাতায় ব'সে আরো সহস্র নাগরিকের মত সংবাদপত্রে এই সব ঘটনা পড়ি—ইচ্ছা হয় নিজে এর ভিতর গিয়ে দেখি সত্যিই ব্যাপারটা কি। ভারতবর্ষ তখন ঝঞ্ঝার কেন্দ্র হ'তে বহুদূরে।

আন্তর্জ্জাতিক রেডিও কনভেনসনের দস্তুর অনুযায়ী যে কোন জাহাজে 'রেডিও অফিসার' রূপে যাওয়ার একখানি প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেটও আছে। কিন্তু বরাবরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বৃটিশ জাহাজে সুযোগ পেলেও যাব না;—কারণ বলা নিষ্প্রয়োজন।

নরওয়ের কলকাতাস্থিত কনসল জেনারেল একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন 'আউষ্ট' (S. S. AUST) নামে ওদের একখানা ১০০০০ হাজার টনের জাহাজ এই প্রথম কলকাতায় এসেছে, জাহাজটির রেডিও অফিসার কেপটাউনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওরা একজন লোক খুঁজছে।

জাহাজটির নাবিকেরা সকলেই য়ুরোপীয়।

জিজ্ঞাসা করলাম 'ভারতীয় রেডিও অফিসার চলবে কি ?' আমায় যেন অ্যাটলাণ্টিক আহ্বান করছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন নয় ?'

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম, 'আমি যেতে পারি।' ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি এ কাজ জান নাকি ?'

হেসে বললাম, 'একটা সার্টিফিকেট আছে, এ পর্য্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয় নাই।'

তিনি বললেন, 'এটা কিন্তু অ্যাটলাণ্টিক লাইনের জাহাজ !'

'ক্ষতি কি ? দেখাই যাক্ না।'

জাহাজে গিয়ে কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হ'ল,—অমায়িক নরউইজিয়ান ভদ্রলোক বললেন,—কেপ্ টাউন থেকে রেডিও অফিসারের অভাবে তারই সহকারী একজন কেনেডিয়ান কোনভাবে জাহাজ নিয়ে আসতে পেরেছে। বোম্বেতে খুঁজেছেন, পাননি ; কলকাতাতেও পাবেন বলে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এইবার আমাকে পেয়ে ভদ্রলোক মহাখুসী। কেনেডিয়ান্ সহকারীটিকে ডেকে বললেন,—'এইবার তুমি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'লে'।

দিন কুড়ি হাতে ছিল, তারই ভেতর তাড়াহুড়ো ক'রে জামাকাপড় যা পারলাম ক'রে ফেললাম।

ইতিমধ্যে ২৩শে জুন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে খবর পেলাম আগেরদিন রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গিয়েছে। বেশ যেন একটু স্বস্তি অনুভব

করলাম—জার্ম্মাণীর সাবমেরিন বহরের অন্ততঃ কিছুটা অংশ এখন তবে অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্র হ'তে স'রে গিয়ে উত্তর সমুদ্রে ব্যাপৃত থাকবে।

সেই সময়ে নিরাপত্তার জন্য কবে কোন মুহূর্ত্তে জাহাজ খিদিরপুর ডক ছাড়বে কাউকেই জানান হ'ত না।

২৯শে জুন রাত্রে জাহাজে ঘুমিয়ে আছি, গভীর নিশীথে মনে হ'ল যেন সেটা নড়ছে। ডক থেকে জাহাজ বের ক'রে নিয়ে সমুদ্রে পৌঁছে দেবার জন্য পাইলট জাহাজে উঠেছে। রাত তখন প্রায়, ইংরাজী হিসাবে ৩০শে জুনের ভোর তিনটে।

আজও মনে পড়ে গঙ্গা-বক্ষ দিয়ে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যেতে যেতে দুপাশের গ্রামগুলি এবং মানুষগুলি দেখে যেন তৃপ্তি আর হচ্ছিল না; কে জানে আবার কতদিন পরে কি অবস্থায় এই বাংলার মাটি দেখব।

বঙ্গোপসাগরে এসে পাইলট যখন আমাদের পৌঁছে দিয়ে পাইলট বোটে নেমে গেল, ভাবলাম সত্যিই তবে চলেছি দেশ বিদেশে, পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে এবং সেই অ্যাটলান্টিক বক্ষে যেখানে ইতিহাসের আর এক পর্ব্ব রচনা হচ্ছে তার মধ্যে!

৫ই জুলাই, সকাল ৭টা। আকাশের গায়ে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ছড়িয়ে রয়েছে। সমুদ্রের জলরাশি আজ যেন আরও নীল লাগছে, প্রায় কালো, তেমনি কলরব চলছে অবিশ্রান্ত ভাবে যেমন কাল দেখে শুয়েছিলাম। পৃথিবীর বুকে কত পরিবর্ত্তন যুগ যুগ ধ'রে হ'য়ে আসছে, কিন্তু সাগরের বুকে হ'তে পেরেছে কি? দিনের চাইতে রাত্রেই ভাল লাগে বেশী। কাল রাতে মনে হচ্ছিল, এই যে ঢেউগুলি অবিরাম গড়ছে আবার ভেঙ্গে প'ড়ে সাদা ফেনা হ'য়ে মিশিয়ে পড়ছে, আদিম মানুষ যেমন দেখেছিল, আমিও তেমনই দেখেছি—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের যোগসূত্র যেন। এই সাগরের বুক বেয়ে বাংলার সেই গৌরবময় যুগের বিজয়সিংহ

সিংহলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর ভিতর ছিল কত অনির্দ্দেশের আকুলি-বিকুলি। এমনি ক'রে কত রাতে তিনিও হয়তো দেখেছেন ওপরে নীল আকাশে ম্লান চাঁদের জলের ওপর ছড়িয়ে পড়া আবছা আলো। তাঁর মনের ভেতরও ছিল ভবিষ্যতের আব্ছা আলো। আজ তিনি নাই, সে বাংলাও নাই, কিন্তু অনন্তকাল, যতদিন পৃথিবীর কোনও ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন না হচ্ছে, এই গভীর নীল বঙ্গোপসাগর তার কোলাহল দিয়ে জানিয়ে দেবে 'আমার এই বক্ষ বহুদিন বহন করেছে জগতের একটা শ্রেষ্ঠ-জাতির গরিমা ও মহিমা। আবার নিকট ভবিষ্যতে আমি তাদেরই হব।'

সমুদ্র দেখি আর ভাবি, সৃষ্টির আদি নাকি এই বিরাট জলরাশি দিয়েই। এই যে অবিরাম কোলাহল—একি তবে প্রথম সৃষ্টির আনন্দ অবিরত উপ্ছে পড়ছে। সমুদ্র যেন আদি শিশু। শিশুর মত অঙ্গ বিচ্ছুরণ, শিশুর মত আর্ত্তনাদ। নবজাত মানব শিশুর অর্থহীন সহস্র কলরবের ভেতর যেমন লুকিয়ে থাকে বিরাট সম্ভাবনা—রত্নগর্ভা ও ঠিক তেমন-ই।

কলকাতা ছেড়ে আটদিন পরে কলম্বোতে পৌছুলাম। সেখানে দেখি বহু পালের জাহাজ—করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সুমাত্রা, জাভা পর্য্যন্ত মাল নিয়ে যাতায়াত করে। আজও এরা প্রাচীন পদ্ধতির অবশিষ্ট যা এখনও বেঁচে আছে, তারই সাহায্যে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করে, কোথায় ঠিক তারা আছে হিসেব করে বের করে। কম্পাস নাই, প্যারালাল রুল নাই, ডিভাইডার নাই, সেক্সটান্ট নাই—অথচ বিশাল বারিধিবক্ষে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে না। অপূর্ব্ব নাবিক এরা!

এই পদ্ধতির সঙ্গে বর্ত্তমান পদ্ধতির মিলনে ভবিষ্যৎ ভারতের নৌবিদ্যা কী অতুলনীয় উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। ঘুমন্ত ভারতবাসীর উপাধানের নীচেই মহাসম্পদ রয়েছে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে তার কিছু নেই—প্রবুদ্ধ হ'লেই আবার আপন সম্পদ ফিরে পাবে।

কলম্বোতে আটদিন থেকে আবার চললাম। গঙ্গার জলের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এখনও অনুভব করছি। সমুদ্রের তো সীমা নাই, প্রাচীর নাই, কেবল কাল্পনিক রেখা টেনে ভূ-পৃষ্ঠের বিরাট জলরাশিকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। গঙ্গার জল এবং ভারতমহাসাগরের জল বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে. এই সব ভেবে গঙ্গার স্পর্শ যেন অনুভব করছিলাম।

শোনা গেল, ভারতমহাসাগরে নাকি একখানা 'রেইডার' দু' একখানা জাহাজ ডুবিয়েছে। তাই কলম্বোতে স্থিত নৌ-বিভাগের অফিস থেকে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল, আমাদের কেপটাউন যেতে হবে প্রথম সিংহল থেকে সোজা বাঁয়ে পশ্চিম মুখে পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রায় উপকূল পর্য্যন্ত টানা একটি সরল রেখা দিয়ে এবং সেখান থেকে কেপটাউন পর্য্যন্ত আর একটি সরল রেখা দিয়ে। মানচিত্র দেখলেই বোঝা যাবে কলম্বো থেকে কেপটাউনের মধ্যকার সরলরেখাই হচ্ছে স্বাভাবিক পথ। বোধ হয় এ পথের কাছাকাছি কোন 'রেইডার' ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাই এ ব্যবস্থা।

কেপটাউনে পৌঁছুবার আগের দিন, প্রায় আঠার দিন বাদে জোহান্‌স্‌বার্গ রেডিও থেকে শুনলাম ৺রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ। রেডিও ষ্টেশন থেকে তাঁর জীবনী ও কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রচারিত হ'ল, মন ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেল। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় তাঁর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ যাচ্ছিল শুনেছিলাম, তবু আশা ছিল যখনই ফিরিনা কেন, বর্ত্তমান দুরবস্থা-প্রপীড়িত ভারতবর্ষে বিধাতার অভয় স্বরূপ প্রাচীন ভারতের একখণ্ড নিদর্শন এই ঋষিকে আবার আমাদের মধ্যেই ফিরে পাবো। আঘাতটা সেদিন খুবই লেগেছিল, মর্ম্মে মর্ম্মে তার মহাপ্রয়ানে আমাদের দীনতা অনুভব করেছি, বোধ হয় সেদিন সম্পূর্ণ একা ছিলাম ব'লেই। জাতিবিশেষের নেতৃত্বে পরিচালিত যে আন্তর্জ্জাতিক

ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে ফেলবার অবিরাম চেষ্টা করছে এবং বর্ত্তমান ভারত আকাশের অভ্যুদিত যে সব জ্যোতিষ্ক ব্যর্থ করছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি সেদিন, যখন দেশ হ'তে, ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও ভাষা হতে ছিন্ন হ'য়ে দূরে বিদেশী ও বিজাতীয় আবেষ্টনীর মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলাম। তাই নিতান্ত পরিজন বিয়োগের মতই তাঁর মহাপ্রস্থান বহুদিন পর্য্যন্ত এমন ক'রে অনুভব করেছিলাম।

'বে' থেকে কেপটাউন—ঠিক একখানি পাহাড়ের গায়ে চিত্র। পরে পৃথিবীর বহু বন্দরই দেখেছি, এমনটি আর কোথাও চোখে পড়ে নাই। জাহাজের ওপর ব'সে ব'সে আফ্রিকার এই নগরীটা দেখায় রূপকথার রাজপুরীর মতনই। আগে আফ্রিকা বলতেই মনে হ'ত ভীষণতা, দুরতিক্রম্য ঘোর জঙ্গল, কুম্ভীর, বনমানুষ, হায়েনা, নরখাদক, কাফ্রী—দূরত্বের অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হ'তে কে এ সুন্দরী আত্মপ্রকাশ করল! আফ্রিকা এত সুন্দরী!

সহর দেখতে গেলাম, মানুষও। ডাচে ও ইংরাজে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা! ডাচেরা ডাচ্ ভাষা চালাতে চায়, ইংরাজেরা ইংরাজী। সুতরাং তার সমাধান হয়েছে দুই ভাষাই পাশাপাশি রেখে। নোটে, ডাকটিকিটে পাশাপাশি ডাচ্ ও ইংরাজী। দেশের সকল সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেও তাই। পরে কানাডাতেও তাইই দেখেছি—ফরাসী ও ইংরাজী এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষাই সব কিছুতেই পাশাপাশি রয়েছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হবে কি উর্দ্দু হবে, আসল সমস্যা ছেড়ে দিয়ে এই সব কৃত্রিম সমস্যা রচনা ক'রে ভারতবর্ষের কেউ কেউ গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ যেটা একটা সাধারণ সমস্যা। আমার সহকারী কানাডিয়ান কর্ম্মচারীটির কাছে আর এক কথা

শুনলাম—সেখানে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার নগ্নরূপ। সাম্প্রদায়িক বিবাদের সময় ভারতবর্ষের মতই ছুরি চলে, বোতল চলে, পাথর, সবই। তিনি নিজে প্রটেষ্টাণ্ট, ধর্ম্ম বিদ্বেষের তীব্রতা বুঝলাম, যখন এ বিষয়ে কথায় কথায় ক্যাথলিকদের নিন্দা করতে করতে তিনি ফস্ করে ব'লে ফেল্লেন, আমি জার্ম্মানদের চাইতেও ক্যাথলিকদের ঘৃণা করি।

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই,—মানব-প্রকৃতি। পাশাপাশি থাকলেই ঝগড়াও করবে, কখন কখন খুনোখুনিও করবে। আবার বন্ধুত্বও হবে, মেলামেশাও হবে, বাইরের শত্রুর সঙ্গে সজ্ঘর্ষের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইও করবে। বহুদিন ধরে সহস্র অবান্তর কথা নিয়ে ভারতীয়দের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা চলছে। আমাদের কর্ত্তব্য বিভ্রান্ত না হ'য়ে মূল প্রশ্নের সমাধানে মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করা।

কেপটাউনে থাকাকালীন এক 'বুয়র' ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস মনে পড়ায় স্বভাবতঃই তার সঙ্গে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করতেই দেখি,—বারুদের স্তূপ! নির্ব্বিবাদে বলে বসলেন ওঁরা নাকি অপেক্ষা করছেন কোনদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কন্‌স্‌ক্রিপসন্' সুরু হয়, সেই উপলক্ষ্য নিয়ে নাকি 'বুয়রেরা' সারাদেশে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দেবে। ভদ্রলোক বললেন,—'দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের সৃষ্টি, কিন্তু আজ যাবতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় অন্যজাতীয় লোকের করতলগত।' আশ্চর্য্য এই, এঁরাও এঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের দিকেই চেয়ে আছেন। আমি কেপ টাউনে যাওয়ার কিছু আগে শুনলাম ভারতীয় সৈন্যদের একটা দল একটি সিনেমায় (কেবল য়ুরোপীয়দের জন্য) প্রবেশাধিকার না পেয়ে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। পরে তাদের সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

বহু ভারতীয় বণিকের সঙ্গে—সকলেই বোম্বাই এবং পশ্চিম ভারতের অন্য অঞ্চলের মুসলমান—আলাপ হ'ল, সাম্প্রদায়িকতার নাম গন্ধ নাই। জিজ্ঞাসা করল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন কতদূর অগ্রসর হচ্ছে সেই কথা। এঁদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গী বাঁকা নয়, সোজা—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর সহস্র অপমানজনক বিধি নিষেধের উল্লেখে বললেন, আমাদের ঘর অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধিকারে এলেই এ সকলের অবসান ঘটবে, তার পূর্ব্বে নয়।

কেপটাউনের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য টেব্‌ল্ পর্ব্বতের ওপর থেকে অন্তরীপ,—মাটি যেখানে ধীরে ধীরে সমুদ্রের আলিঙ্গনে প্রবেশ ক'রে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে। সুন্দর বললে অসম্পূর্ণ থাকবে, অদ্ভুত বললেও বলা শেষ হবে না। কেবল প্রথম ইন্দ্রিয় দিয়েই এ সৌন্দর্য্য বোঝা চলে। চিত্রের দ্বারা হয়তো একটু ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ, আভাষমাত্র দেওয়া চলে, ছাপার কালির অক্ষরে ফোটাবার চেষ্টা নিরর্থক।

আমাদের গন্তব্য লক্ষ্য ইংল্যাণ্ড। কলম্বো থাকতে শুনেছিলাম কেপটাউন থেকে 'কনভয়-এ' ইংল্যাণ্ডে যাব। কেপটাউনে এসে তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। শুনলাম কেবল দু'একটি 'কনভয়' ইংল্যাণ্ড থেকে সোজা কেপটাউনে গিয়ে থাকে। পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরালিওন অঞ্চলের ফ্রি টাউন তখন ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজগুলির 'কনভয়'এ যাওয়ার প্রধান আড্ডা, অর্থাৎ বৃটিশ জাহাজ সবই।

আমাদের জাহাজ নরওয়ের। জার্ম্মানীর নরওয়ে অধিকারের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রবক্ষে ও বিভিন্ন মহাদেশের বন্দরে অবস্থিত নরওয়ের জাহাজগুলি এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। উত্তর সাগর দিয়ে নরওয়েতে ফিরে যাওয়ায় উপায় নাই। নরওয়ের রাজা হ্যাকন তাঁর গভর্ণমেণ্ট নিয়ে লণ্ডনে পালিয়ে এসেছিলেন; তিনি ঘোষণা করে দিলেন,

জাহাজগুলি এখন থেকে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের কাজে লাগবে। কথাটা স্পষ্ট ক'রে না বললেও সকলেই বুঝল গোপনে যদি কেউ দেশে যাওয়ার চেষ্টা করে সেটা লক্ষ্য রাখবে ইংলণ্ডের উত্তর সাগরের রণতরী বহর।

নরউইজিয়ান নাবিকদের সম্বন্ধে এই অবস্থায় কিছু সন্দেহ থাকার জন্যই বোধ করি আমাদের ফ্রি টাউনের 'কনভয়ে' যাওয়া হ'ল না।

আপন দেশ এক শক্তির অধীনে এবং নাবিককুল বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষে, এই অদ্ভুত অবস্থা তখন য়ুরোপের অনেক দেশেরই হয়েছিল। আমাদের জাহাজের ডেনমার্ক দেশীয় একজন নাবিক একদিন দুঃখ করে আমাকে বলছিল, 'জার্ম্মাণী আমাদের দেশ নিয়েছে আর ইংল্যাণ্ড নিয়েছে জাহাজগুলি।' বৃথা জটিলতার সৃষ্টি না ক'রে বিশ্ব-রাজনীতির মূল কথাই এই লোকটির মুখে যেন বেরিয়ে পড়ল। একদিন সকালে উঠে শুনি পরদিন আমরা ব্রেজিলের 'পারনামবুকো' অভিমুখে রওয়ানা হব; সেখান থেকে 'ট্রিনিডাড' গিয়ে নাকি 'কনভয়' ধরতে হবে। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা ক'রে শুনলাম এখনও কিছু ঠিক নেই, আমরা ইংল্যাণ্ডেই যাব, না যুক্তরাষ্ট্রের (আমেরিকা) কোন বন্দরে মাল নামিয়ে এ যাত্রার মত আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে। ব্রেজিলে পারনামবুকোর নরওয়ের কনসালের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে ওখানে পৌছে নির্দ্দেশ পাওয়া যাবে।

তারপরদিন সত্যই আমরা দক্ষিণ আটল্যান্টিকে বেরিয়ে পড়লাম। কেপটাউন পর্য্যন্ত দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে পেরেছিলাম—দিল্লীর রেডিও কেন্দ্র হতে উৎক্ষিপ্ত রেডিও ঢেউ সাহায্যে ভারতীয় ভাষা, গান, সুরলহরী যতদিন ধরতে পারছিলাম। তাই কেপটাউন পর্য্যন্ত নিজেকে ভারত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন মনে করিনি।

কিন্তু দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকের বুক বেয়ে যেদিন দক্ষিণ আমেরিকা মুখে পাড়ি দিলাম সেদিন আর পেলাম না দিল্লীর ভারতীয় কণ্ঠের

সাহচর্য্য। সেইদিন হ'তে সুরু হ'ল সম্পূর্ণ একাত্ম জীবন। দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকের বিস্তৃত বক্ষে মধ্যে মধ্যে জার্ম্মাণ 'রেইডার' জাহাজগুলি উপস্থিত হ'য়ে যুদ্ধের প্রায় প্রথম দিক থেকেই বাণিজ্য জাহাজগুলির মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছিল। 'গ্রাফ-স্পীর' কীর্ত্তি সকলেরই মনে থাকতে পারে। এ ধরণের একখানি জাহাজ এক বৎসর দেড় বৎসর পর্য্যন্ত দেশে না ফিরে ক্রমাগত বাণিজ্য পোতের সন্ধানে টহল দিয়ে বেড়াতে পারে, দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের বিশালত্বের জন্য। 'গ্রাফ-স্পী'র পরেও আরও দু'একখানা রেইডার এ কাজ করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু যে বিস্তীর্ণতা এদের সাহায্য করে, সেই বিস্তীর্ণতাই আবার বানিজ্যপোতগুলিকেও কতকটা এদের এড়াতে সহায়তা করে।

নাবিকদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, এখন কোন রেইডার পথের কোথাও আছে কিনা? তবু বহুদিন পর্য্যন্ত এ ধরণের আক্রমণ হয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। তথাপি আশঙ্কা আছে। দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক ঠিক 'অ্যাটলান্টিক যুদ্ধের' রণাঙ্গন নয়, অর্থাৎ রাশি রাশি জাহাজ এখানে সমুদ্রগর্ভে যায় নি। একে বলা চলে অ্যাটলান্টিক রণাঙ্গনের ব্যূহমুখ।

কলকাতা থেকে কেপটাউন পর্য্যন্ত জাহাজের আলোগুলোর ওপর কোন বিধি নিষেধই ছিল না, স্বাভাবিক অবস্থার মত রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোতে আশে পাশের সমুদ্র বক্ষ ঝিক্‌মিক্ করে উঠছিল। দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকে সুরু বিধি নিষেধ, জাহাজের ভিতরের ক্ষীণমাত্র আলো যেন বাইরে না আসতে পারে। রাত্রিতে সূচীভেদ্য অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে জাহাজ চলছে আপন পথে। অন্ধকারের মধ্যেই ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রহরীদের দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, রাত্রির কৃষ্ণতার মধ্যে আর এক টুকরো কৃষ্ণতর কিছু সমুদ্রের ওপর কখন চোখে পড়ে কিনা। শুধু 'রেইডারের' ভয়ে নয়, অন্য কোন বাণিজ্যপোতের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার ভয়েও। বহু

দূরের কিছু নজরে আসে না। কাছাকাছি একখানা বাষ্পীয় পোতের মত বৃহৎ কিছু থাকলে আভাষ পাওয়া যায়।

কিন্তু মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে পৃথিবীর উপগ্রহটি যখন এসে পড়েন তখন এ সাবধানতার কতটুকু মূল্য থাকে জানিনা। তবে অভিজ্ঞ নাবিকেরা বলে, সমুদ্রের ওপর আলোকরশ্মি চট্ করে বহু, বহু দূরে, কুড়ি মাইল দূরেও, চোখে পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আঠার দিন পরে ব্রেজিলের 'পারনামবুকো' নামে বন্দরে পৌছুলাম। এ যেন আর একটি বাংলা দেশ। তেমনি কুটির সব চোখে পড়ল। তেমনই শ্যামাঙ্গ মানুষগুলি। বাঙ্গালীর দেহের বর্ণের সৌন্দর্য্য যে কতখানি, আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল দীর্ঘকাল শ্যামাঙ্গ সাহচর্য্য হতে বঞ্চিত থেকে। বাঙ্গালী মেয়ের কমনীয়তার উৎস, সে ঐ নবপল্লবের মত শ্যামবর্ণ।

অভিসন্ধিপূর্ণ বিদেশী প্রচার কার্য্যে শ্যাম আর কৃষ্ণবর্ণকে একাকার ক'রে দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানের শিক্ষা অর্থাৎ বিদেশী প্রচারে অভিভূত আমরাও তাই সত্য বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু অপরূপ দেহের এই স্বাভাবিক বর্ণ না দেখে কিছুকাল কেবল শ্বেতের ভিতর থাকলে, অবশেষে শ্বেত, কৃষ্ণ ও শ্যাম বর্ণের মানুষ দেখলে সহজেই গায়ের রং হিসেবে শ্যামের সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে—অন্ততঃ আমার পড়েছিল।

কিছুকাল পরে কোনরূপ প্রচার কার্য্যের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট ও এ' কার্য্যে অনভিজ্ঞ কয়েকজন সরল বিভিন্ন দেশীয় শ্বেতাঙ্গকে জার্ম্মান জাহাজে বন্দী থাকা কালে দেখেছি নিদারুণ গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নের খরতর সূর্য্য কিরণে ছাদের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দিনের পর দিন। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করে শুনেছি সখের 'সান্-বাথ' নয়, গায়ের শ্বেতত্বকে ব্রাউন করা অর্থাৎ সাদা কথায় শ্যামের কাছাকাছি একটা রংএ যদি পৌঁছতে পারা যায়।

খালি গায়ে, খালি পায়ে, শিশুরা সব রাস্তায় খেলা করছে। গ্রীষ্মের আবহাওয়াতে আমাদের মধ্যে যে ক্লান্তি ও অবসাদ আনে, এখানেও তাই। জামা কাপড়ের ওপর যে দৃষ্টি, আমেরিকা, ইংলণ্ড বা কানাডায় জনসাধারনের মধ্যে দেখেছি এদের সে সব কিছুই নেই; কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। আঁটসাঁট ট্রাউজারের ভেতরে যেন অস্বস্তি লাগছে—যেন ভারতের ধুতির প্রচলন এখানে হ'লেই স্বস্তি পেত।

এখানে আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ বহু কাফ্রী পেলাম। নোংরা কাজটা এরাই করছে—অর্থাৎ জাহাজে কয়লা বোঝাই। শ্যামাঙ্গ একজন ব্রেজিলিয়ানকেও দেখিনি একাজে। নিগ্রোরা এখানকারই অধিবাসী হয়ে গিয়েছে। এদেরই ধর্ম্ম, ভাষা, রীতিনীতি গ্রহণ করে কৃষ্ণ ব্রেজিলিয়ানে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মত নিগ্রো উৎপীড়ন এখানে হয় কিনা, খোঁজ নিতে পারি নাই ভাষা বিভ্রাটের জন্য। ইংরাজী এখানে অচল; পথে ঘাটে এমন একজনও পড়ে না যে ইংরাজী দু'টা কথাও জানে। ইংরাজী জানা থাকলে আমাদের মত সাধারণ লোকের—পৃথিবীর কোথাও ভাষা বিভ্রাট হ'তে পারে না, একথা যে কতদূর অসত্য এখানে প্রত্যক্ষ করেছি। কেবল ব্রেজিল নয়—দক্ষিণ আমেরিকার অন্য সব দেশেই এই অবস্থা। পর্ত্তুগীজ বা স্পেনীয় এখানে ভ্রমণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অনেকদিনের ধনীবাড়ীর ভৃত্য যেমন আপন প্রভুকে সকল ধনীর শ্রেষ্ঠ ভাবে ভারতবাসীরও যেন সেই অবস্থা! ভারতবর্ষের বাইরে ইংল্যাণ্ড ছাড়াও যে প্রকাণ্ড ভূভাগ আছে যেখানে ইংরাজ বা ইংরাজী আমরা অপর বিদেশীদের যে সাধারণ চক্ষে দেখি ঠিক সেই ভাবেই দেখে, যুদ্ধের সময় ছাড়া শান্তির সময়ে এই নামটিও সাধারণ লোকের কানেও যায় না, একথা যেন আমরা ভাবতেই পারি না।

ব্রেজিল ছেড়ে আমরা যাচ্ছি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের সেণ্টলুসিয়া নামে একটি দ্বীপে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউপোর্টনিউজ যাওয়ার পথে। অলস মন্থর গতিতে প্রশান্ত, সুনীল সমুদ্র বক্ষ দিয়ে চলেছি —। আটদিন লাগবে সেণ্টলুসিয়া পৌঁছুতে। পঞ্চমদিন বেলা প্রায় দশটায় ব্রীজের উপর ঘুরে ঘুরে নানা রকমের অলস কথা হচ্ছিল, বহুদূরে দিগন্তে যেন একখানা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। দূরবীন দিয়ে দু'জনে দেখছি, সেকেণ্ড অফিসার এবং আমি। দূরে কোন বাষ্পীয় পোত সঙ্গীহীন সমুদ্রে কদাচিৎ দেখতে ভাল লাগে। চীফ্ অফিসারও বেড়াতে বেড়াতে ওপরে এসেছে। সেও আর একটি দূরবীন তুলে দেখতে দেখতে হঠাৎ কাপ্তেনকে ডেকে নিয়ে এল।

সে সময় মিত্রপক্ষীয় কোন জাহাজই মাস্তুলে জাতীয় পতাকা ওড়াত না; নিরপেক্ষ দেশের জাহাজগুলি পতাকা উত্তোলিত রেখেই সমুদ্রে ঘোরাফেরা করত। এ জাহাজটায় একখানা পতাকা দেখা যাচ্ছে যেন!

অনেকক্ষণ ধরে পর্য্যবেক্ষণ করে কাপ্তেন শুষ্কমুখে বললেন ফিনল্যাণ্ডের জাহাজ! ফিনল্যাণ্ড তখন জার্ম্মানীর পক্ষে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমেরিকার সঙ্গে অ্যাক্সিস-এর যুদ্ধ তখনও সুরু হয় নাই। ফিনল্যাণ্ডের পতাকার আড়ালে একখানি জার্ম্মান রেইডার হওয়া বিচিত্র নয়।

আমাদের জাহাজটির গতিশক্তি বাড়াবার জন্য ইঞ্জিনরুমে বলা হ'ল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, ঘণ্টা খানেক পরে দূরে সেইটি ক্রমেই আমাদের ধরে ফেলছে। উপায়? কিছু করার নেই। কেবল আমাদের গতিমুখ পরিবর্ত্তিত করে অপেক্ষা করা। যদি সত্যিই জার্ম্মান জাহাজ হয়, সে-ও তার গতি বেগ বদলাবে আমাদের পিছু নিতে।

রুদ্ধনিশ্বাস না হ'লেও, কতকটা সেই ভাবে সকলে অপেক্ষা করছি পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য। ভীষণ গরম, লাইফ জ্যাকেট কারুরই গায়ে ছিল

না, আস্তে আস্তে সবাই পরে নিল। অবশ্য সকলেই আপন আপন কাজ করছে, হৈ চৈ এর নাম গন্ধ নেই। কেউ কারুর কাছে মনের ভীতি প্রকাশ কচ্ছে না, কিন্তু সকলের মুখেই চাপা কিসের একটা ভাব সুস্পষ্ট।

দেখি, ফিনল্যাণ্ডের জাহাজখানা আমাদের খুব কাছে, প্রায় মাইল চারেকের ভেতর এসে পড়েছে। অকস্মাৎ সেটিও তার গতি ও গতিমুখ পরিবর্ত্তন করে অন্যপথে দ্রুত চলে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে প্রায় ৯০° ডিগ্রীর একটি কোন রচনা করে গভীর সমুদ্রের দিকে।

সকলেই বুঝলাম, একই মনস্তত্ত্ব ঐ জাহাজের অধিবাসীদের ভেতরও কাজ কর্চ্ছে। যুদ্ধের সময় সকল বাণিজ্য পোতই সশস্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু সে কথা না বলাই ভাল। প্রয়োজনের সময় সে সশস্ত্রতা সাহায্যের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশী—যদি কোন রেইডারের সম্মুখীন হয়ে পড়তে হয়। ১৯১৪—১৮ সালের সেই মান্ধাতা আমলের একটি ৪" নৌ-কামান জাহাজের ল্যাজের ওপর (অ্যাফ্‌ট্‌) বসান থাকে, আর থাকে ব্রিজের ওপর দুইদিকে দু'টি 'লুইস' মেসিন গান বা 'মার্লিন' বিমান বিরোধী মেসিন গান।

সমুদ্রবক্ষে সাবমেরিন চোখে পড়লে সাবমেরিনটি টর্পিডো ছাড়বার আগেই পিছন ফিরে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে তার ওপর বা কাছাকাছি গোলা নিক্ষেপ করতে পারলে সাবমেরিনের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় সত্য। কারণ, প্রথমতঃ জাহাজ এঁকে বেঁকে চলার জন্য সাবমেরিন লক্ষ্য স্থির করতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, ওটার নিজেরও আত্মরক্ষার স্পৃহা আছে; কামান চালাতে থাকলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ডুব মারতে হয়। মধ্যে মধ্যে জার্ম্মানীর কিছু সাবমেরিন এইরূপ শিকার করতে এসে শিকারের দ্বারা নিজেরাই ঘায়েল হয়েছে, বাণিজ্য জাহাজের নাবিকদের উৎক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে।

আর ব্রাজের ওপর মেসিনগান থাকলে, গানার যদি স্থির মস্তিষ্কে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আক্রমনকারী বিমানের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ করে, তবে বিমানের পাইলট নিজের নিরাপত্তার জন্য একেবারে নীচে নেমে এসে অভ্রান্তভাবে জাহাজটির ওপর বোমা ফেলতে পারে না।

আমাদের পেছন ফিরতে দেখে, বোধ হয়, ফিনল্যাণ্ডের জাহাজটি ভাবল, জাহাজের ল্যাজের ওপর কামানটি তার দিকে ঘুরিয়ে লক্ষ্য করবার জন্যই আমরা গতিমুখ বদলেছি। নাগালের ভেতরে এলেই এ জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ সুরু হবে। তাই সেখানা 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির অনুসরণ করল। কিন্তু মজা এই, আমরা নিজেরাও সে নীতিরই অনুসরনের চেষ্টায় ছিলাম।

হিটলারের ঝটিকা-বাহিনীর সংগঠক ক্যাপ্টেন রোয়েম, বাহিনীর সকলকে এই বলে উৎসাহ দিত, 'ভয় পেয়ো না, বিপক্ষও তোমাদের দেখে এমনি ভয়ই পাচ্ছে।' কথাটি অতি সত্য।

দু'দিন বাদে কতকগুলি দ্বীপের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি—ডানে, বামে, সম্মুখে, পিছনে, ছোট ছোট পাহাড়, বৃক্ষ, লতা সুশোভিত মাটি। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, মাটির স্নিগ্ধতা, বনানীর সঙ্গে মানুষের একান্ত নিবিড়ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হয় ধরাপৃষ্ঠের জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন বহু দিনের সমুদ্র ভ্রমণের পর। নাবিক মাত্রই তখন সুযোগ পেলে ছুটে আসত দেখতে। মাটি তখন তার কাছে হ'য়ে ওঠে অপরূপ সৌন্দর্য্যের উৎস। কতক্ষণে আবার লোহার পাটাতন থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে অনুভব করবে ভূমির স্পর্শ।

এই দ্বীপগুলি আকের জন্য প্রসিদ্ধ। জাহাজের ওপর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, পাহাড়ের গায়ে আঁকা বাঁকা, সরু সরু পথ।

সেণ্টলুসিয়া দ্বীপটি খুব ছোট—মনোরম। বার মাস এখানে বসন্ত ঋতুর কাছাকাছি একটা অবস্থা থাকে। দ্বীপবাসী প্রায় সকলেই নিগ্রো

এবং কিছু ইংরাজ ঔপনিবেশিক। ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের ব্যবসায়ী দু'চার জন এখানে আছে। যুদ্ধের নাম গন্ধ এখানে নেই; পরিপূর্ণ শান্তির আবহাওয়া। এখানে নিগ্রো নারী শ্রমিকেরা জাহাজে কয়লা তোলে ছোট ছোট চুবড়ী ভ'রে, চুবড়ী পিছু আধ পয়সা মত মজুরী পায়। এতটুকু ক্ষুদ্র দ্বীপেও এমিগ্রেসন বিভাগের উচ্চপদগুলি ইংরাজ বংশধরদের জন্যই যেন রক্ষিত দেখলাম—নিগ্রোর জন্য বোধ হয় শ্রমিকের কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে!

ফেরবার পথে এরই কয়েক মাইলের মধ্যে আমেরিকান অধিকৃত সেণ্ট-টমাস্ দ্বীপে কয়লার জন্য গিয়েছিলাম, সেখানকারও অধিবাসী নিগ্রো কিন্তু এমিগ্রেসন ষ্টাফ নিগ্রোই দেখলাম, বড় বড় দোকানও ওদের আছে—জাহাজে প্রকাণ্ড ক্রেনের সাহায্যে কয়লা দেওয়া হয়।

কী পার্থক্য!

সেণ্টলুসিয়া ছাড়বার পর যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের সুবিখ্যাত জাহাজ নির্ম্মাণের ইয়ার্ড নিউপোর্টনিউজের পথে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদই ভাবছিলাম। ভারত ত্যাগের পরে এতখানি রাস্তায় কোনও রূপ বিপদের আভাস পাই নাই। এখন একেবারে আমেরিকার ঘরের দুয়ারে জার্ম্মাণীর আক্রমনের বাহু লম্বিত হবে না বলে ধরেই নিয়েছিলাম।

উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই হয়নি এই চৌদ্দ দিনে। রাতে একদিন শুয়ে আছি, প্রায় রাত ১১টা হবে, এক নরউইজিয়ান অফিসার এসে আমার ক্যাবিনের দরজা ধাক্কা দিয়েই নির্ব্বিবাদে ঢুকে বললেন 'এস, এস, ঘুমুচ্ছ কি; দেখে যাও কি সুন্দর নগরী!' ভদ্রলোক নিজে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুকেও দেখাতে এসেছেন।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি সমতল ভূমিতে আলোকমালা সজ্জিত সুন্দর এক নগরীর পাশ দিয়ে আমরা বন্দরে প্রবেশ করছি। বে'র মুখে

পথ নির্দ্ধারণের জন্য ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, ভারতের মন্দিরগুলির মত। আমেরিকান পাইলট তারই সাহায্যে নিরাপদ গভীরতার মধ্য দিয়ে জাহাজটিকে বন্দরে নিচ্ছে। কোথায় জলের কত গভীরতা, বাইরের নাবিক জানেনা এবং সকল দেশেই বন্দরের নিকটবর্ত্তী গভীরতা, বিদেশীর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়—উপকূলেরও। তাই এই সমস্ত পথ এসে অবশেষে তদ্দেশীয় পাইলটের সাহায্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করে। আরও কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু এই মুখ্য কারণ।

ভার্জ্জিনিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। নিগ্রো ক্রীত-দাসদের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, ভার্জ্জিনিয়া স্বভাবতঃই তাতে দাসপ্রথা রহিত করবার বিপক্ষ দলেই ছিল। শুধু তাই নয়, ক্রীতদাস প্রথা অটুট রাখবার দলের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই প্রদেশটি। ক্রীতদাস প্রথা রহিত বা বহাল রাখার প্রশ্ন নিয়ে রহিতকামী উত্তর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি পরাজিত হ'লে, সুবিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে যে লোকটি নাটকীয়ভাবে একটি প্রেক্ষাগৃহে হত্যা করেছিল সেই 'বুথ' এই প্রদেশের লোক।

বন্দরের জাহাজ-নির্ম্মান ইয়ার্ডে তখন একখানা বড় ব্যাট্‌ল্‌সিপ তৈরী হচ্ছিল, বহু শ্বেত ও কৃষ্ণ শ্রমিক কাজ কচ্ছিল। জায়গাটি রীতিমত গরম এবং কলকাতার মতনই এখানে দেহ থেকে অনর্গল স্বেদ নিঃসরণ হয়। প্রভেদ এই, রাস্তা, ডক সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধূলোর নাম গন্ধ নেই। তাই, দেহের ঘামের সঙ্গে রাস্তার ধুলো এঁটে কলকাতার সাধারণ পথ-চারীদের যে বিরক্তিকর অবস্থা হয় সেটা এখানে নেই। ইয়ার্ডের ভেতর কর্ম্মনিরত শ্রমিকদের তৃষ্ণা নিবারণের এবং প্রক্ষালন ক্রিয়ার জন্য লোহার চৌবাচ্চাতে কৃত্রিম উপায়ে শীতল করা জল রক্ষিত।

মজুরীর হারে সাদা ও কালার কোন প্রভেদ দেখিনি—জানিনা, সে প্রভেদের অভাব কেবল তখনকার মত যুদ্ধকালীন নীতি কিনা।

রাস্তায়, ঘাটে, সিনেমায়, আমোদ প্রমোদের স্থানে এবং গৃহের সর্ব্বত্রই উচ্চ বর্ণের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের সঙ্গে নীচ বর্ণের কৃষ্ণ আমেরিকানরা, আমেরিকান সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ভদ্রলোক আমাদের জাহাজে নিউপোর্টনিউজে খাদ্যাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করলেন, তিনি একদিন তাঁর বাড়ীতে জাহাজের অফিসারদের সান্ধ্য ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন। পরিচারিকা দেখলাম নিগ্রো, এবং ভারতবর্ষে যেমন গৃহে নিম্ন বর্ণের পুরাতন দাসী চাকরদের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ওপর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, ওখানেও তেমনি।

শুনেছি, ক্রীতদাস প্রথা রহিত হ'লেও এখনও বহু নিগ্রো নরনারী তাদের পুরাতন প্রভুদের গৃহ ছেড়ে যেতে রাজী না হ'য়ে তাদের গৃহেই ছিল, এখনও বংশ পরম্পরা অনেকে আছে।

আমেরিকানদের কর্ম্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা, সুসজ্জিত গৃহগুলি, মনোরম রাজপথগুলি, অতুল বৈভব এবং বিভিন্ন বর্ণের নরনারী নিয়ে গঠিত এই দেশ দেখে মনে হ'ত বুঝি গৌরব মণ্ডিত প্রাচীন ভারতের আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস এযুগে নতুন করে অভিনীত হচ্ছে।

নিজে চোখে দেখি নাই,—কারণ অল্প দিনই আমি এখানে ছিলাম, কানাডার একজন ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন, এখনও দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির অনেকাংশে রাস্তায় নিগ্রো আসছে দেখলে, কোন কোন অ-কৃষ্ণ আমেরিকান যাতে তার ছায়াও গায়ে না লাগে সেজন্য নিজেই অপর ফুটপাথে চলে যায়। সকল বর্ণ সমস্যার দেশে এই বোধ হয় দক্ষিনী রীতি।

অনেক দিন পরে টোকিও যুদ্ধ-বন্দী শিবিরে অবস্থান কালে একজন আমেরিকান কর্ণেল আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যখন ইংরাজের টোলে পড়া নতুন শেখা বুলি ভারতের অস্পৃশ্য সমস্যা ইত্যাদি কথার অবতারণা করছিল তাকে আমি তার নিজের দেশের কথা উল্লেখ করে থামিয়ে দি, বলি, চিকিৎসক মহাশয়, আগে নিজের রোগ আরোগ্য করুন।

মোটের উপর সাধারণ আমেরিকান নাগরিক বিদেশীর সঙ্গে ব্যবহারে আমাদেরই মত ভদ্র, বিনয়ী এবং নিজ সংসারে অনুরক্ত যেমন অন্য সকল সভ্য সমাজে হ'য়ে থাকে।

প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম—এবার কানাডার হ্যালিফ্যাক্স অভিমুখে। ওখান থেকেই নাকি আমাদের কনভয়-এ ইংল্যাণ্ড যেতে হবে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম নিউপোর্টনিউজে এসে অনেক অফিসার ও রেটিংই ওখানে জাহাজ ছাড়তে চাইলো। নরউইজিয়ান জাহাজগুলিতে সুবিধে এই সাতদিন পূর্ব্বে কাপ্তেনের কাছে নোটিশ দিয়ে জাহাজ ছাড়া যায়। আমাকেও অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমিও কাজ ছাড়বার নোটিশ দিয়েছি কিনা? কানাঘুষায় শুনলাম সকলেরই আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে যেতে আপত্তি। ২০° পশ্চিম দ্রাঘিমা সহস্র সহস্র নাবিকের জলসমাধি ক্ষেত্র। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং অপর দিকে ব্রিটেন, এর মধ্যে অবস্থিত উত্তর অ্যাটলাণ্টিকই হচ্ছে বহু কথিত 'অ্যাটলাণ্টিক যুদ্ধে'র রঙ্গভূমি।

প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত না থেকেও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করছিল। নাবিক পাওয়া তখন দুষ্কর। তাই এমিগ্রেসন্ কর্ম্মচারীরা বলে বসলেন, নরউইজিয়ানরা আবার যদি এ জাহাজেই না যায় তো ওদের স্থলে একেবারেই আসতে দেবে না—যদিও

সকলের কাছেই আইন সঙ্গত পাসপোর্ট আছে এবং বিধি মত যথেষ্ট অর্থও আছে, এবং ইতিপূর্ব্বে এমন কোন বিধানই ছিল না।

দিন বারো পরে হ্যালিফ্যাক্সে পৌছুলাম। 'বে'তে বহু জাহাজ রয়েছে দেখলাম, সকলেই 'কনভয়'এর প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখানেও তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হ্যালিফ্যাক্স সহরে আঠার দিন ছিলাম, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সহরে একটি হোটেলে অন্য একটি জাহাজের নাবিক বলল, ওরা আমাদের বাইশ দিন আগে এসেছে কিন্তু এখনও বসেই আছে। আরও শুনলাম, মাসখানেক আগে গোটা পাঁচ ছয় 'করভেটের' রক্ষণাবেক্ষণে একটি কনভয় ইংল্যাণ্ডের দিকে গিয়েছে, 'এসকর্ট' করবার মত কোন রকমের রণতরী এখন এখানে নাই। তাই বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যদ্দিন না পূর্ব্বোক্ত 'এসকর্ট' জাহাজগুলি আবার একখানা 'কনভয়' নিয়ে ফিরে আসে। সংবাদ শুভ! তার মানে নিশ্চিন্ত মনে আমরা এখানে খাওয়া, ঘুমোন, সিনেমা দর্শন ইত্যাদি করে বেড়াতে পারি আরও মাসাধিক কাল। তবে শোনা কথা—সত্যতা জানি না।

৩০শে জুন কলকাতা থেকে আমরা জাহাজ ছাড়ি এবং এখন প্রায় অক্টোবরের মাঝামাঝি—চার মাস হ'ল, এখনও ইংল্যাণ্ডেই যাচ্ছি! এ হিসেবে চললে একখানি জাহাজের ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে ফিরে আসতে এক বৎসরের ধাক্কা! চমৎকার ব্যবস্থা! অ্যাটলান্টিক পথে ইংল্যাণ্ডের ফুসফুসে অতি সামান্য অম্লজান বায়ুই যেতে পারছে!

হ্যালিফাক্স কানাডার অতি পুরাতন সহর। নোভাস্কোসিয়ায় অ্যাটলান্টিকের অপর পার থেকে প্রথম ঔপনিবেশিক দল বাসা বাঁধে। সে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। কাজেই সহরটিও সে সময়কার ব্রিটেনের সহরগুলির ছাঁদে ঢালা। এখনও সেইরূপই আছে।

রেস্তোরাঁতে ও লণ্ড্রী ব্যবসায় এখানে এবং কানাডার সর্ব্বত্রই চীনাদের একচেটে। যে রেস্তোরাঁতে আমরা প্রায়ই সন্ধ্যের সময় যেতাম, দেখতাম চীনা সত্বাধিকারী এক কোনে কাউণ্টারে বসে আছে, কানাডিয়ান পরিচারক ও পরিচারিকারাই সব কাজকর্ম্ম করছে। ফলের ব্যবসায়ে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানীদের আধিপত্য ছিল। ধীবরের কার্য্যেও জাপানীরা কানাডায় বেশ দু'পয়সা রোজগার করছিল। এখানে বহু নিগ্রো আছে। কিন্তু কানাডাতে বর্ণ বা জাতি বিদ্বেষ খুব লক্ষিত হয় না। ক্যাথলিক, প্রটেসটাণ্টে ধর্ম্ম বিদ্বেষ মধ্যে মধ্যে মাথা তুলে ওঠে। বাড়াবাড়ি হ'লে লাঠি না চালিয়েই টিয়ার গ্যাস দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ দমন করেন।

আমাদের জাহাজটিকে অবশ্য এখানে আরও একমাস অপেক্ষা করতে হয় নাই। দিন কুড়ি এখানে থাকবার পর আমাদের যেতে হ'ল হ্যালিফ্যাক্সের আরও উত্তরে সিডনী বলে আর একটি বন্দরে। এইখান থেকে একটি 'কনভয়' সপ্তাহের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড যাত্রা করবে। আমরাও তার অন্তর্ভুক্ত হব।

'কনভয়' 'কনভয়' শুনে শুনে একেবারে বিরক্তিই ধরে গিয়েছিল সবার। এ কি ব্যবস্থা! কলম্বোতে শুনলাম কেপটাউন থেকে, কেপটাউনে ফ্রি টাউন থেকে, শেষে ট্রিনিডাড থেকে. সেণ্টলুসিয়ায় শুনলাম যুক্তরাষ্ট্রের কোন বন্দরের বাইরে থেকে, যুক্তরাষ্ট্রে আবার হ'ল হ্যালিফ্যাক্স থেকে, এখন আবার সিড্নী থেকে! আশা করা কিছু বিচিত্র নয়, সেখানে বুঝি শুনবো ঘুরিয়ে নাক দেখাতে দেখাতে এতদূরই যখন একাকী আসা গেল বাকী পথটুকু অর্থাৎ ৩৫০০ মাইলের জন্য আর এ ঝঞ্ঝাট কেন?

দু'দিন পরে সিড্নীতে পৌঁছে জানলাম সেদিনই বেলা দুটোর সময় কনভয় ছাড়বে, তাই আমাকে তার পূর্ব্বে রেডিও অফিসার্স্ কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হ'ল। এতদিনে সত্যই অ্যাটলান্টিক যুদ্ধের রণাঙ্গনে প্রবেশের আয়োজন সমাধা হ'ল।

সিড্‌নীতে বসে বসে তাই ভাবছিলাম, এখান হ'তে বহু সহস্র মাইল দূরে ভারতবর্ষে থাক্‌তে কোনদিন বুঝি নাই, ভ্রমণ যাবার প্রাক্কালে কতই না বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। অথচ সে বন্দোবস্তের মধ্যে জটিলতা কিছু নাই, নিতান্ত সহজ, অনাড়ম্বর। সাবমেরিন, রেইডার সমাকীর্ণ সমুদ্রগুলিতে মিত্রপক্ষের জাহাজ চলাচল সম্বন্ধে যে সব গল্প, প্রবন্ধ পড়েছি, তাতে যুদ্ধকালে সমুদ্রভ্রমণের বিপদের মাত্রা কতখানি কেবল যেন তা-ই দেখাবার চেষ্টাই রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিপদ যে আছে, সে কথা অস্বীকার কেউ-ই করতে পারে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আজ বেশ সুস্পষ্ট রূপেই প্রতিভাত হচ্ছে, সত্যিই বিপদের মধ্যে এসে পড়লে মানুষের মনও ক্রমেই ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সত্যিকার বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা জীবন যাত্রারই একটা অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ায়।

সম্মুখে উত্তর অ্যাটল্যান্টিকের জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই ভাবছি, ওপারে ঐ ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় আজ সকল যাত্রীরই বহু বিপদ সম্ভাবনা রয়েছে। এখান থেকে বা ইংল্যাণ্ড থেকে যারা বেরুচ্ছে এ পথে, তাদের ভেতর কেউ নিরাপদে যাত্রাপথ অতিক্রম করতে পার্চ্ছে, কেউ বা পার্চ্ছে না। তাই আজ যদি শুধু যাত্রাপথে বিঘ্ন আছে ব'লেই মানুষ এ পথের ব্যবহার একেবারেই ছেড়ে দেয় তো ইংল্যাণ্ডকে চিরদিনের মত মানচিত্র হ'তে মুছে যেতে হবে। হল্যাণ্ড বা স্পেনের মত এ দেশও বিগত ইতিহাসের মাত্র কয়েক ছত্র পাতা জুড়েই থাক্‌বে। তার বেশী নয়।

পৃথিবীর মুক্ত পথে বেরিয়ে পড়লেই ভারতবাসীর সকল সঙ্কোচ, সকল সন্দেহের অবসান হবে।

অ্যাটলান্টিক রণাঙ্গনে

কানাডার হ্যালিফ্যাক্স বন্দরের কিছু উত্তরে সিড্‌নী থেকে বিরাট এক 'কনভয়' উত্তর অ্যাটলান্টিক পা'র হ'য়ে ইংল্যাণ্ড যাবে, আমাদের জাহাজও সেই 'কনভয়'-এর অন্তর্ভূক্ত হ'ল। তাই যাত্রার দিন ২৪শে অক্টোবর (১৯৪১) বেলা ১১টার সময় নেভি অফিসে রেডিও অফিসার্‌স্ কনফারেন্সে আমন্ত্রিত হ'য়ে গেলাম। আমি গিয়ে দেখি সকলেই এসে গিয়েছে—বহু জাতির যেন সমাবেশ হয়েছে, কানাডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান, নরউইজিয়ান, ডেনিস, ইংরাজ, স্কচ্‌, গ্রীক, ডাচ্‌ এবং আমি। ভারতীয় আর কাউকেই দেখলাম না। কারণ, প্রথমতঃ, ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজগুলিতে রেডিও অফিসার সবই ইংরাজ, ভারতীয় রাখে না এবং দ্বিতীয়তঃ, অপরাপর বিদেশী জাহাজে সে দেশের লোকই কাজ করে।

জাহাজের সব কাজ থেকেই—লস্করী বাদে—ভারতীয়দের দূরে রাখাই মনে হয় সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্য। মানুষ যে কাজ করে নাই বা দেখে নাই, দূর থেকে তা'কেই ভয়ানক কিছু একটা মনে করে। খুব সহজ, মামুলী কাজ এইরূপে না দেখে দেখে এবং পরের মুখে ঝাল খেয়ে, ভারতবাসীরা সত্যই অনেক সময় বিশেষ কঠিন মনে ক'রে বসে। নেভিগেসন শিক্ষা ব্যাপার নিয়ে তো ভারত গভর্ণমেণ্ট এটাকে একটা বহ্বাড়ম্বে লঘুক্রিয়া বিশেষে পর্য্যবসিত করেছে। এ কথাগুলো উল্লেখ করছি 'ডাফরিনের' তামাসা নিয়ে—যেন নৌ-বিদ্যা এমন একটা জিনিষ যা' ভারতীয়দের মগজে ঢুকতে এখনও অনেক কাল লাগবে, যেন নৌ-চালনা

কোনদিন তারা করে নাই! অথচ শাসক শাষিত জাতি সম্বন্ধহীন নরওয়ের 'আউষ্ট' জাহাজে অতি নিবিড়ভাবে যা' লক্ষ্য করেছি, তা'তে এই-ই বলতে পারি যে বেশী দূর যেতে হবে না, আমাদের ভবিষ্যৎ জাহাজ-গুলিতে সব কাজ যখন বাংলা ভাষাতেই চলবে, তখন নৌ-বিদ্যা শিখতে সাধারণ লেখাপড়া জানা বাঙ্গালীর বড় জোর এক বৎসরের বেশী লাগতে পারে না।

কতভাবে কত মিথ্যা অবান্তর কথার সৃষ্টি ক'রেই না পৃথিবীর সকল প্রকারের জ্ঞান বিজ্ঞানের স্রষ্টা অতীতের এই ভারতের আর্য্যদের আত্মজ, পরবর্ত্তী বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন যুগে আমাদের বিভ্রান্ত ক'রে রাখা হচ্ছে। গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরবর্ত্তী সমতল ভূমিতে আবিষ্কৃত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত সকল ব্যবহারিক জ্ঞানের কণামাত্র সম্পদ একদিন পশ্চিম সীমান্ত পথে য়ুরোপে পৌঁছেছিল। প্রাচীন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' নীতি বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত ক'রে, সেই য়ুরোপ-বাসীই কণামাত্র জ্ঞানকে নির্ব্বিবাদে আপনার ব'লে আত্মসাৎ করেছে, নিদ্রিত বর্ত্তমান আর্য্যদের পিতৃ ও বংশপরিচয় নিয়ে নানা প্রকারের জঘন্যতা, 'ইতিহাস' নামে প্রচার কর্‌ছে! ম্লেচ্ছ জাতিগুলির আর্য্যের পুনরুত্থান ভীতিতে তাই বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীকে চিহ্নিত করা হচ্ছে অনার্য্য, বর্ণশঙ্করের জাতি ব'লে! যে বাংলা ভাষার সু-সংস্কৃত রূপই সংস্কৃত ভাষা নামে পরিচিত, তাকেও তাই বলা হচ্ছে বর্ণশঙ্কর ভাষা!

বিশেষ ক'রে আজিকার এই দুর্দ্দিনে প্রতি বাঙ্গালীকে নিয়ত স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে, যে জাতির অতীত যত বেশী গৌরবমণ্ডিত, কালচক্রে বিজাতি দ্বারা পিষ্ট অবস্থায়, সেই জাতির অতীত তত বেশী মসীলিপ্ত করা হ'য়ে থাকে। দুষ্টা সরস্বতীর পূজারীদের লেখনীমুখে তাই আমাদের গৌরবদৃপ্ত আর্য্য পূর্ব্বোবর্ত্তীগণ উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছেন ককেশাশ পর্ব্বতমালার কাছে,

চিরতুষার মণ্ডিত উত্তর মেরু প্রদেশে, মধ্য এশিয়ায় অথবা এমনই ধারা বহু অসম্ভব প্রদেশ! উদ্দেশ্য সু-পরিষ্কার। যেমন ক'রেই হোক্ না কেন, পৃথিবীবক্ষে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক নেতৃত্বের ইতিহাস মুছে ফেলতে হবে। মোহাবিষ্ট ভারতবাসী যেন পিতৃপরিচয় ভুলে পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্ব-চেষ্ট না হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী জাতি যেন নিজেকে নিতান্ত আধুনিক একটা বর্ণশঙ্কর এবং ইতিহাসহীন লোক-সমষ্টি ভেবে চিরকাল কোন একটি জাতিবিশেষের মুখপানে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে।

আমার সৌভাগ্য যে আমি ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধহীন বিদেশী জাহাজে যুদ্ধকালে বেরুতে পেরেছিলাম, তাই সকল জিনিষ দেখবার ও শিখবার সুযোগ থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করে নাই, বা পারে নাই। য়ুরোপীয় ও কানাডার অফিসারদের রেডিও বিভাগে আমার নেতৃত্বে কাজ করতে বাধে নাই, সে প্রশ্নই কোনদিন ওঠে নাই। য়ুরোপীয় 'ক্রু'র মধ্যে ভারতীয় অফিসার,—ইংরাজদের কাছে বড়ই অস্বস্তিকর লাগছিল। আফ্রিকায় এবং ইংল্যাণ্ডে অনেক নৌ-কর্ম্মচারী কাপ্তেনকে এবং আমাকে অনেকবারই প্রশ্ন করেছে—অবশ্য খুব কৌশলে, কেমন ক'রে আমি এ জাহাজে এলাম।

আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তার সোজা জবাব কোনদিনই দিই নাই, প্রশ্নের উৎস কোথায় বেশ বুঝছিলাম বলেই। পাল্টা প্রশ্ন ক'রে উত্তর দিতাম, 'কেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর না?'

দেশ রক্ষায় নৌ-বিদ্যার স্থান বিবেচনা করলে, ভারতবাসীকে এই সহজ ও স্বাভাবিক বিদ্যা থেকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য বুঝতে বিলম্ব হয় না এবং দেশের অন্যান্য বহু বিষয়ের মত ভক্ষকের নিকট এ' বিষয়েও রক্ষা প্রার্থনা করা অরণ্যে রোদন।

বেলা প্রায় ২টার সময় আমাদের জাহাজ বন্দর ছাড়ল। বন্দরের বাইরে কিছু দূরে সমুদ্রের ওপর নির্দ্দিষ্ট একটী স্থানে সব জাহাজ একত্র হ'য়ে এস্‌কর্ট (প্রহরী) জাহাজগুলির সঙ্গে উত্তর অ্যাটলান্টিক পার হবে। ঘণ্টা তিন বাদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখি কোথাও কিছু নেই। হয়তো অন্য গুলি এখনও এসে পৌঁছায় নাই। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোন চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না কারো। কাপ্তেন রেডিও রুমে এসে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন, ঠিক যে বিন্দুটিতে এবং যে সময়ে আমাদের আস্‌তে বলা হয়েছিল আমরা ঠিক সেইখানেই এতক্ষণ রয়েছি, অথচ দেখ মজা, কোন কিছুরই পাত্তা নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কিছু করতে পারি কিনা?

এখন মুস্কিল এই, কানাডার ও যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল থেকে সুরু করে সারা উত্তর অ্যাটলান্টিকের যে কোন স্থানে নাৎসী সাবমেরিনগুলির গতিবিধি। রেডিও ডাইরেকসন্ ফাইণ্ডার নামে একটি যন্ত্র আছে, এর সাহায্যে যে কোনও বিশেষ জায়গা হ'তে রেডিও তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হ'লে, কোথা থেকে এ তরঙ্গ আস্‌ছে নির্ণয় করা যায়। তাই উত্তর অ্যাটলান্টিকে রেডিও সাহায্যে কোন প্রকারের সংবাদ আদান প্রদান ভীষণ বিপজ্জনক। এমন কি, গভীর নিশীথে কনভয়-এর কোন জাহাজ আক্রান্ত হ'য়ে জল-সমাধি হ'লেও রেডিওর সাহায্যে সাহায্য প্রার্থনা নিষিদ্ধ। হয়তো কাছাকাছি দুই চারি শত মাইলের মধ্যে কোন সাবমেরিন বা অন্য কোনরূপ শত্রুর জাহাজ শিকারের সন্ধানে ঘোরা ফেরা করছে, কিছু বলা যায় না—আমাদের রেডিও তরঙ্গ ধ'রে অনায়াসে খুঁজে বের ক'রে ফেলবে। অথবা দূরত্বের জন্য তার পক্ষে আমাদের ধরা অসুবিধা হ'লে, অ্যাটলান্টিকের বিভিন্ন স্থানের সাবমেরিনগুলিকে আমাদের সন্ধান দেবে।

আমরা যদি এখন রেডিও সাহায্যে কনভয় এখন সমুদ্রের ঠিক কোথায় আছে খোঁজ নেবার চেষ্টা করি, এই সব বিপদ সম্ভাবনার জন্য স্বভাবতই কোন উত্তরই কনভয়-এর নায়ক দেবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষ বুঝে নেবে, এই মূহুর্ত্তে একটা কনভয় উত্তর অ্যাটলাণ্টিকের ওপর আছে, এবং তার স্থিতিস্থান কানাডার বেশী দূরে নয়। শত্রুপক্ষ আমাদের খুঁজে বের ক'রে হয়তো আক্রমণ চালাবে না, গোপনে অনুসরণ করবে। যদি আমরা কনভয়-এর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি, তখন একসঙ্গে ৫০।৬০।৭০টি জাহাজ পেয়ে বহু সাবমেরিন সুযোগ মত বহুদিক থেকে একসঙ্গে আক্রমণ সুরু করবে সমস্ত জাহাজগুলির ওপর।

কখন কখন সবগুলো আক্রমণে যোগ দেয় না। দু'তিনটে সাবমেরিন আক্রমণ সুরু ক'রে কনভয়ের কিছু জাহাজ ধ্বংশ করলে, এসকর্টের দ্রুতগামী ক্ষুদ্র করভেটগুলির জলবোমার দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন এরা জলের বহু নীচে গিয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে। অন্যান্য সাবমেরিন যেগুলো আক্রমণে যোগ দেয়নি এবং যাদের অস্তিত্ব করভেট-গুলি জানেনা তারা সে সময় অনুসরণ ক'রে চলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এবং আবার সুযোগ বুঝলেই সেই প্রণালীতে আক্রমণ সুরু ক'রে দেয়। একবার যদি কোন কনভয় বিশাল অ্যাটলাণ্টিকের প্রসারতার সুযোগ সত্ত্বেও শত্রুর সাবমেরিন দ্বারা কখন চিহ্নিত হ'য়ে পড়ে তো আক্রমণ চলে তত দিন, যতদিন পর্য্যন্ত হতাবশিষ্ট জাহাজগুলি ইংল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে না পৌঁছায়। তার ওপর আবার আছে বোমাবর্ষী বিমানের আক্রমণ। প্রকাণ্ড বড় কনভয় ইংল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছে, সমুদ্র থেকে সাবমেরিনগুলির কাছ থেকে এ সংবাদ পেলে, জার্ম্মাণীর এবং ইতালীর বোমাবর্ষী বিমান বহর তাদের অ্যাটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী কোন বিমান ঘাঁটির প্রসারিত বাহুর মধ্যে কনভয়টি এসে পড়লে, সুযোগ

পেলেই বিমান আক্রমণ সুরু করবে। স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে তাই কনভয় এসে পড়লে, শত্রুর বিমান আক্রমণের পক্ষে প্রশস্ত।

এ সম্বন্ধে কাপ্তেনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, কাজেই তাঁকে রেডিও সাহায্যে কনভয়ের বর্ত্তমান স্থিতির সংবাদ নেবার চেষ্টায় যে বিপদ হ'তে পারে, স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি তা' থেকে বিরত হ'লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কনভয়ের কোন নিশানাই না পেলে কি করবেন? সিডনীতেই আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে নাকি? তিনি বললেন, 'না, চারমাস বাদে এতদিন পর ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য সমুদ্রে বেরিয়ে, কনভয় না পাওয়ার জন্য আর আমি ফিরতে রাজী নই।' জাহাজের উচ্চতম স্থানগুলির সর্ব্বত্র প্রহরা রেখে সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে যতদূর চলে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে, আরও কিছুক্ষণ অনুসন্ধান ক'রে যদি কনভয় দেখা না যায় তো বাঁকা পথে, গ্রীনল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ডের উপকূলের কাছ দিয়ে অনেকটা একটি অর্দ্ধবৃত্তের মত রচনা ক'রে বৃটেনে পৌঁছুবার চেষ্টা করবেন।

আবহাওয়া তখন খুবই খারাপ—শীতের সময় প্রায় সর্ব্বদাই উত্তর অ্যাটল্যাণ্টিকের এ অবস্থা; ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত লেগেই আছে। পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউএর ওপর দিয়ে দুপাশে একেবারে শুয়ে পড়ার মত কাৎ হ'য়ে দুলতে দুলতে জাহাজখানি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্মুখের স্ফীত জলরাশির ওপর জাহাজের সম্মুখভাগ উত্তোলিত হ'য়ে এক একসময় একে যেন পিছনের ওপর ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আবার, পর মুহূর্ত্তে, পশ্চাতের স্ফীত জলরাশি জাহাজটিকে পাতালপুরীর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এক একটি বিপুলাকার ভঙ্গুর তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে জাহাজটির গায়ের ওপর ভেঙ্গে প'ড়ে ব্রীজের ওপর যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ক'রে দিচ্ছে। সারা সমুদ্রবক্ষে যেন অবিরাম নব নব পরিখা ও প্রাচীরের

রচনা হচ্ছে। সমুদ্র এখানে উন্মত্ত। এই বিপুলাকার উন্মাদের বিপুল দেহের বিচ্ছুরণে ও অর্থহীন, ক্লান্তিহীন, গর্জ্জনে এবং আকাশের বাধাহীন বায়ুর নিঃস্বণে দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় অভিভূত হ'য়ে পড়ে। অরূপের রূপ পরিগ্রহের সে কী আকুলি বিকুলী!

ব্রীজের ওপর যারা দাঁড়িয়ে আছি, পাশের মানুষের স্বাভাবিক গলার কথা কিছু শুনতে পারা যাচ্ছে না। কিছু বল্‌তে হ'লে কানের কাছে মুখ এনে স্বর সাধনের নলীটিকে যতদূর সম্ভব স্ফীত ক'রে ভাষা বের করতে হয়। নতুবা এ দুর্য্যোগে, মানবমুখ নিঃসৃত শব্দ তরঙ্গ সৃষ্ট হবার অবকাশ পায় না।

অপরূপ এই আদি প্রকৃতির রূপ দেখে ক্লান্তি হয় না, শ্রান্তি আসে না। বহুবার দেখা এই দুই ভূতের বিরামহীন ক্রীড়া দেখতে দেখতে নাবিকের ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কেটে যায়। নির্ব্বাক আমরা দু'জন—চিফ নেভিগেটিং অফিসার এবং আমি—ব্রীজের ওপর এক কোণে মেশিনগান রাখবার গলা পর্য্যন্ত উঁচু মোটা ইস্পাতে ঘেরা বন্ধনীর ভেতর দাঁড়িয়ে আছি, ভঙ্গুর তরঙ্গগুলি থেকে সিক্ত হবার ভয়ে।

সমুদ্র দেখছি, অ্যাটলান্টিক রণাঙ্গন দেখছি। অনেকক্ষণ ঐভাবে কাট্‌ল—আমার নিজের তখন কাজের পালা নেই,-হঠাৎ দেখি, সমুদ্রবক্ষে দূরে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে তিনি কি বল্‌ছেন। বলা এবং শোনার ব্যবধানের মধ্যে দ্রষ্টব্য বিষয়টি বিরাট দুই স্ফীত জলরাশির মধ্যকার ফাটলের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। একটু পরে বিপরীত অবস্থা এ'লে যখন পাশের দুই উন্নত জল প্রাচীর ভেঙ্গে পড়্‌ল এবং ফাটল মিলিয়ে গিয়ে সে জায়গাটি হ'ল সু-উচ্চ, দেখি, কিছু দূরে আরোহীহীন শূন্য এক জীবনতরী সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আছাড়ি পিছাড়ী খাচ্ছে।

ঘনঘটাময় এই আবেষ্টনে একক এবং পূর্ণাবয়ব জীবনতরী! পাশের অফিসারটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে ব'লে উঠলেন 'এই তো জীবন!' কতক্ষণ পূর্ব্বেও ঘনসন্নিবেশিত এই কাষ্ঠখণ্ডগুলি কোন একটি জাহাজের পার্শ্বদেশে ঝুল্‌ছিল, বিপদ্‌কালে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও কতকগুলি মানুষের জীবনরক্ষার জন্য। কিন্তু সমুদের এ' অবস্থায় চরম মূহুর্ত্তটি যখন সত্যই এসে পড়্‌ল, জাহাজ থেকে ওটিকে নিরাপদে জলে নামাবার সুযোগ হয় নাই। জাহাজখানি অতলে যাবার সময় বুঝিবা জীবনতরীটি তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় দূরে প'ড়েছিলো। অথবা, এ'র ওপর কয়েকটি মানুষ আস্‌তে পেরেছিলো। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই বিশালাকার ভঙ্গুর তরঙ্গের প্রচণ্ড পরিমাপহীন নিম্নমুখী আঘাতে সমুদ্রক্রোড়ে অদৃশ্য হয়েছে।

কে জানে গুপ্ত আক্রমণকারী সাবমেরিন আমাদের কত নিকটে? নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, কনভয়-এর একটি জাহাজও যে দৃষ্টি পথে পড়ে নাই, তার সঙ্গে এই শূন্য জীবনতরীর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা? হয়তো রণাঙ্গনে প্রবেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত কনভয় অন্য পথে ঘুরেছে; আমাদের অপেক্ষায় বিশিষ্ট সময়টি পর্য্যন্ত থাকে নাই।

পাশের ভদ্রলোকটিও সম্ভব এই কথাই ভাবছিলেন, আবার বল্‌লেন, এই তো যুদ্ধকালীন নাবিক জীবন!

আরো কিছু সময় অতিক্রান্ত হ'ল। সন্ধ্যার ম্লান দৃষ্টিকে রাত্রির কৃষ্ণতা আচ্ছন্ন করে করে, চার্ট রুম ও রেডিও রুমের ওপরকার ছাদে প্রহরায় নিযুক্ত নাবিকটি সংবাদ দিল, দুর্য্যোগে সঙ্কুচিত দিক্‌চক্রবালে আমাদের দক্ষিণ পাশে সে জাহাজ দেখতে পেয়েছে—একখানা নয়, অনেকগুলি।

কনভয়।

ইঞ্জিনে যত শক্তি রুদ্ধ ছিল সব খুলে দিয়ে জাহাজ ছুটলো সেদিকে। অন্ধকার সমুদ্রপৃষ্ঠকে গ্রাস করবার পূর্ব্বেই ওদের সঙ্গে মিলিত হ'তে হবে। নতুবা রাত্রির অন্ধকার কেটে গেলে পরদিন প্রত্যূষে সর্পগতি 'কনভয়' কোন মতেই ধরা যাবে না। যে আহ্নিক গতিতে পৃথিবীর সেই অংশ স'রে যাচ্ছে আলোর কাছ থেকে, তারি সঙ্গে যেন বাষ্পীয় শক্তি উদ্ভূত জাহাজের গতির প্রতিযোগিতা চল্‌লো!

কনভয়ের একখানা রক্ষী জাহাজও আমাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে তীব্র গতিতে। আগেই সেখানা কোনপ্রকার সঙ্কেত করবে না আমাদের উদ্দেশ্যে। কে আমরা, ছদ্মবেশী শত্রু জাহাজ কিনা, প্রথমে নির্দ্ধারণ করবে।

এটি একখানা 'করভেট'। ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত—মেষপাল রক্ষায় নিযুক্ত শিকারী কুকুর। লম্বায় কমবেশী ১৫০ ফিট; প্রস্থও তদনুরূপ। অস্ত্র সজ্জা নিতান্ত সাধারণ। গোটা তিন ছোট ৩" ইঞ্চি বা ৪" ইঞ্চি কামান। বৈশিষ্ট্য—খর গতি এবং গভীরতা আলোড়নকারী জলবোমা। ঘণ্টায় ৩০।৩৫ সামুদ্রিক মাইল অতিক্রম করতে পারে, দু'পাশের ঢালা পাটাতন সাহায্যে সমুদ্রে দ্রুত জলবোমা নিক্ষেপ করবার যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত আছে।

অনেকটা লাফাতে লাফাতে এই বামন রণপোতটি আমাদের জাহাজের খুব কাছে এসে পরিচয়াদি নিয়ে তারপর কনভয়ে যোগ দিতে বলল। কথাবার্ত্তা হ'ল দুপক্ষেরই, লাউড স্পীকার দিয়ে। জিজ্ঞাসা করল, জাহাজের নাম কি, কোথা থেকে আস্‌ছি, গন্তব্যস্থল ইংল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের কোন বন্দর, কনভয়ে আমাদের জাহাজ কত সংখ্যক?

সিড্‌নী থেকেই রক্ষী জাহাজগুলির নায়ক তাঁর কনভয়ে যারা যাবে, তাদের নাম ধাম গোত্র পরিচয় ইত্যাদি পেয়ে থাকে।

তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, লাউড স্পীকারের সাহায্যেই জানিয়ে দিল, কনভয়ের ঠিক কোন শ্রেণীর কোন জায়গাটি আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকারে জাহাজগুলি যখন পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ভয়ে বহু দূরে দূরে থেকে চল্‌বে, তখন কতরাত্রি পর্য্যন্ত কি গতিতে কোন দিকে যাবে এবং তারপরেই বা গতিমুখ এবং গতি কোন দিকে কতখানি হবে, নির্দ্দেশ দিল।

পরদিন ঊষার আলোকে দিঙ্‌মণ্ডল পুনরায় যখন দৃষ্টিগোচর হ'বে তখন হয়তো অনেক জাহাজই দলের মধ্যে পাওয়া যাবে না। ঘন কুয়াসায় অনেকেই যূথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়তে পারে। তাই পরদিন সকালে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যত ডিগ্রি, মিনিট, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সংযোগ স্থলে আমাদের রাঁদেভু বা মিলন স্থান, তা'ও জানান হ'ল।

সন্ধ্যাহারের সময় আমাদের মধ্যে সেই জীবন তরীটার কথা হচ্ছিল। সকালে যারা প্রাতঃকালীন আহার করছিল, বেচারারা জানতও না সন্ধ্যায় আর তারা খেতে বসবে না! মধ্যাহ্ন আহার হয়েছিলো কিনা, কে জানে? কিন্তু সকলেরই একটা মহা স্বস্তি বোধ হচ্ছে কনভয় পেয়েছে ব'লে। একটা কথা কেউ-ই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, সমুদ্রের ওসব জায়গায় জাহাজটাকে অনুসরণ না ক'রে দৃষ্টিগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ সাবমেরিন ওটাকে ধ্বংশ করলো কেন? আবার ভাবলাম, সাবমেরিন হয়তো একটি-ই সমুদ্রের সেই অংশে কয়েক শত মাইলের মধ্যে ছিল। নাগালের বাইরে দুই পাখীর চেয়ে হাতের ভেতর এক পাখী শ্রেষ্ঠ, এই নীতির অনুসরণ ক'রে কাজ করেছে।

দুপুর থেকে সুরু করে এ পর্য্যন্ত, সারাটা সময় নিজের কাজ না থাকা সত্ত্বেও, কেবল কৌতূহলবশে বাইরের দুর্য্যোগে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এক রবার সুটের আবরণে দাঁড়িয়ে ছিলাম। খেয়ে উঠে ক্যাবিনে

গেলাম, গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে। ভীষণ ঠাণ্ডা। হাতের চেটো, পায়ের তলায় যেন একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ স্চঁ ফুটছে। তুলো, পশম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ক্যাবিন উষ্ণ রাখবার জন্য গরম বাষ্পের চেম্বারটি বেশ কয়েক পাক মুচড়ে খুলে দিতে ঘরটি এতক্ষণে আরামপ্রদ হ'ল।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের পর গরম ঘরে নরম বিছানা, মোটা লেপের আরাম,—বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গলো ভোর চারটের সময় যখন আমার এলার্ম ঘড়ি বেজে উঠে কাজের পালা এসেছে জানিয়ে দিল।

চার্টরুমে খবর নিলাম কোন পথে আমরা যাচ্ছি। জাহাজের গতিমুখ তখন পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে ; অর্থাৎ সেই মুখে যদি বরাবর চলি কিছু দিনের মধ্যে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে পড়ব! বাইরে ব্রীজের ওপর সেকেণ্ড অফিসার ঐ গাঢ় কৃষ্ণতার মধ্যে কনভয়ের অন্যান্য জাহাজ নজরে রাখবার বৃথা চেষ্টা করছে। ঘন তিমির ও কুয়াসায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘাড়ের ওপর কেউ না এসে পড়ে বা আমরা কারো ওপর পড়ে আর এক বিভ্রাট না বাঁধাই, তাই জাহাজ হতে, থেকে থেকে, অনেকক্ষণস্থায়ী আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে।

সকাল হ'লে দেখা গেল, এত পুরু কুয়াসা, তিন গজ দূরের কিছুও চোখে আসে না। অনবরতঃ এ জাহাজ থেকে আওয়াজ দেওয়া হ'তে লাগলো, কাছাকাছি অন্যগুলিও তাই করছে, বুঝলাম কনভয় হ'তে বিচ্ছিন্ন হই নি। খানিক কুয়াসা কাটল অনেক পরে। দেখা গেল প্রায় ত্রিশখানা জাহাজ কনভয়ে নাই—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এতগুলি!

নির্দ্দিষ্ট মিলন স্থানে পৌছে ওদের জন্য অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ, কোনও চিহ্নই নাই। দু'খানা করভেট কনভয় ছেড়ে বেড়িয়ে গেল

যদি খুঁজে বের করতে পারে। আরো কিছু পরে, অন্য করভেটগুলির সঙ্গে আমরা চলেছি—এবার আমাদের গতিমুখ পশ্চিমের কিঞ্চিৎ গা ঘেঁষে উত্তর দিকে, প্রায় উল্টো মুখে। ঘণ্টা চার বাদে আবার যাচ্ছি সোজা পূর্ব দিকে। সারাদিন ধ'রে এইরূপ বিচিত্র গতিতে ভেসে ভেসে, আমরা ইংল্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছি না পিছিয়ে পড়ছি অথবা মোটামুটি একই জায়গায় রয়েছি, মানচিত্রের গায়ে দাঁগ না কেটে বুঝতে হ'লে অঙ্ক কষার প্রয়োজন হয়।

বিকেলের দিকে দূরে দিগন্তে কয়েকখানা জাহাজ দেখা গেল, কিছু সময়ের মধ্যে মিলিত হ'লাম ওদের সঙ্গে। কাল রাতের যূথভ্রষ্ট দলটি, সঙ্গে সেই দুখানা রক্ষী জাহাজ। তিনখানা পাওয়া যায় নাই, একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন যদি ওরা নিরাপদে থাকে তো কপাল ঠুকে আপন আপন ইচ্ছামত পথে ওদের অ্যাটলান্টিক পার হবার চেষ্টা করতে হবে। কাল যে শূন্য জীবন তরীটি ভাসতে দেখেছিলাম তার অর্থও পরিষ্কার হ'ল। নবাগতদের মধ্যে একখানি ওলন্দাজ জাহাজ আমাদের পাশে পাশে যাচ্ছিল। দেখি, ওটির একটি জীবন তরী নাই। বোধ হয় বন্ধন সুদৃঢ় ছিল না, তরঙ্গের আঘাতে এবং প্রচণ্ড বাতাসে মুক্ত হ'য়ে সমুদ্রে পড়েছিল, তাই দেখেছি আমরা।

পরদিন আকাশ কতকটা পরিষ্কার। এ' কনভয়ে আছে মোট প্রায় ৭০ খানা জাহাজ, পরস্পরের ভেতর প্রায় ১০০ গজ ব্যবধান রেখে কয়েকটি সারিতে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে চলেছে। জাহাজগুলির সামনে দু' তিন খানা করভেট অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে সমুদ্র শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে শিকারী কুকুরের মত। ওদের কাছে আছে জলের নীচে সাবমেরিন সন্ধানী যন্ত্র। জলের নীচে ইঞ্জিন থামিয়ে যদি চুপ ক'রে বসে থাকে সাবমেরিন, তো স্বতন্ত্র কথা। নতুবা যদি জলের নীচ দিয়ে চলতে থাকে,

তার শব্দ সমুদ্রগর্ভে কতকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হবেই,—এই শব্দকে ধরবার যন্ত্রই হচ্ছে সাবমেরিন সন্ধানী যন্ত্র—হাতী, ঘোড়া কিছু নয়। সাবমেরিন-গুলিও এ' যন্ত্র রাখে, নীচে ব'সে জলের ওপর দিয়ে কোন জাহাজ যেতে থাক্‌লে, জানবার জন্য।

সমগ্র দলটির সম্মুখে, দক্ষিণে এবং বামে, এভাবে দু' তিনখানা ক'রে করভেট প্রায় দশ মাইলব্যাপী অর্দ্ধব্যাসে কনভয়টিকে কেন্দ্র ক'রে সারা স্থান পরীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। এদের কেউ সন্দেহজনক কোন শব্দ পেলে ছুটে এসে পতাকার সাহায্যে সঙ্কেত ক'রে জাহাজগুলিকে হয় অন্য কোনদিকে যেতে বলে অথবা একেবারেই কোনদিকে আর অগ্রসর হ'তে নিষেধ করে দেয়।

তারপর দু'তিন খানা করভেট জাহাজগুলির আশে পাশে থাকে—বাকীগুলি ছুটে যায় সন্দেহজনক সমুদ্র বিন্দুটির কাছে এবং তার সর্ব্বদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে জল বোমা বর্ষণ করতে থাকে। সাবমেরিন জলের নীচ থেকে ওপরে না উঠলে সত্যিই ধ্বংস হ'ল কিনা, বোঝবার ষোলো আনা উপায় নাই। জলের ওপর তেল ভেসে উঠলে এ'টি নষ্ট হয়েছে মনে করাও অনেক সময় ভ্রমাত্মক। কারণ, ওপরের শত্রুকে বিপথে চালিত করার জন্য অনেক সময় সাবমেরিন নিজেই এ কাজ করে। জল বোমার আক্রমনের সময় সমুদ্রের অনেক নীচে গিয়ে আত্মরক্ষা ক'রে আক্রমন বন্ধ হ'লে আবার সাবধানে কনভয় অনুসরণ বা প্রতি-আক্রমণ করতে চেষ্টা করতে পারে। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে কনভয় গতি ও গতিমুখ পরিবর্ত্তন ক'রে চলে।

'কনভয়ের' উদ্দেশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ নয়—শত্রুকে এড়িয়ে আপন গন্তব্য স্থানে যাওয়া। সমুদ্রের বিশালতার সুযোগ নিয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে যুদ্ধ সাম .া এবং খাদ্যসম্ভার যথোপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দেওয়া। পৃথিবীবক্ষের

মহাসমুদ্রগুলিতে কোনদিনই কোন জাতি বা জাতিসমষ্টির মিলিত সাবমেরিন বহর পরিপূর্ণভাবে বাণিজ্য জাহাজগুলির ভ্রমণ পথ রোধ করতে পারে না। কাজেই, জাহাজের যাতায়াতের পথ থাকবেই। তবে যে পথ সাতদিনে যাওয়া যেতো হয়তো এ' অবস্থায় লাগবে চৌদ্দদিন, কুড়িদিন, পঁচিশ দিন বা আরও বেশী। উপকূলের কাছে বা সমুদ্র যেখানে উপসাগরে পরিণত হ'য়েছে সেইখানে সম্পূর্ণরূপে জাহাজ চলাচলের ওপর দৃষ্টি রাখা চলতে পারে বটে, কিন্তু সে সুবিধা দু'পক্ষই পাচ্ছে।

যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা; শত্রুকে আক্রমণ ক'রে ধ্বংশ করতে হবে যখন সে দুর্ব্বল, তার কাছে অস্ত্র নাই, অথবা যে অস্ত্র আছে তার সাহায্যে প্রতিযোগীর মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারে না। উভয়েরই সমশ্রেণীর অস্ত্র থাকলে অন্তরালে থেকে অস্ত্র চালাতে হবে—সে যেন আক্রমণকারীকে দেখতে বা ছুঁতে না পায়।

বন্দরের কাছাকাছি যেখানে জলের পরিধি কম, মহাসমুদ্রের ওপর ক্ষুদ্র কতকগুলি জাহাজকে প্রকাণ্ড প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র পয়সার মত খুঁজে বেড়াতে হবে না সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষাকারী দেশটির কেন্দ্রীভূত শক্তিও সেখানে রয়েছে। কাজেই সেখানে কাউকে আক্রমণ করতে গেলে নিজেকেও ধ্বংশ হবার জন্ত প্রস্তুত হ'তে হবে। মরতে নারাজ পৃথিবীর সকলেই। এ'কথা ভুললে চলবে না, সকল দেশেই সকল কালে 'সাধারণ' মানুষই সেনা বিভাগে, নৌবিভাগে বা বায়ুবিভাগে প্রবেশ করে। তাই 'সাধারণ' মানুষের সহজাত সাহসের এক কাণাকড়ি বেশী শৌর্য্য এসব বিভাগে থাকতে পারে না।

কিছু কিছু অসম সাহসিক পুরুষ সকল দেশেই সকল কালে জন্মগ্রহণ করে—তাঁরা মুষ্টিমেয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা দেশের সমর, নৌ বা বিমান বিভাগে থাকেন তাঁরাই যুদ্ধের সময় কখন কখন অসম সাহসিক কাজ

ক'রে সঙ্গের সাথীদের উৎসাহিত এবং জনসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করেন। এই শ্রেণীরই কয়েকজন নাৎসী সাবমেরিন নায়ক বৃটেনের রণতরী বহরের একটি প্রধান কেন্দ্র 'স্কাপা ফ্লো'-তে যুদ্ধের প্রথম দিকে হানা দিয়ে বেশ কিছু ক্ষতি করেছিলো, কিন্তু এমন লোক সর্ব্বত্রই বিরল। দু' চারটি অসম সাহসিক কাজে বিস্ময় উৎপাদন চলে কিন্তু যুদ্ধের গতির ওপর এগুলির প্রভাব খুব নাই। সকল যুদ্ধের গতি ও পরিণতি নির্ভর করে 'সাধারণ' মানুষের যতটুকু সাহস বা সামর্থ্য, তা-ই দিয়ে; এবং সাধারণ মানুষ নিতান্ত ভীরু ব'লেই তাকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বিপজ্জনক কাজে অনেক সময় 'বাধ্য' ক'রে।

অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে মানুষের এই সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিকেই কার্য্যকরী করা হয়। অস্ত্রশিক্ষা আনে আত্মবিশ্বাস। যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখী শত্রুর সামনে প'ড়ে গেলে 'সাধারণ' মানুষ রাজানুগত্য, দেশপ্রেম, বা আত্মোৎসর্গের কথা ভাবে না, ভাবে স্বয়ং নিহত হবার পূর্ব্বেই কেমন ক'রে শত্রুকে নিহত ক'রে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে। তাই, যে নেতৃত্ব 'সাধারণের' নিকট হ'তে অ-সাধারণ গুণসকল প্রত্যাশা না ক'রে, নীতি, অস্ত্র প্রভৃতি সাধারণোপযোগী ক'রে চলে—শাশ্বত কালে তা'র জয় অনিবার্য্য।

বন্দরের বা উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রে সে দেশের রণতরী বা বিমান নিয়ত প্রহরা দিচ্ছে, তাই সাধারণতঃ শত্রুর সাবমেরিন এসব জায়গার একটু দূরেই থাকে জাহাজের প্রতীক্ষায়। অবশ্য এ' দেশগুলিতে বন্দর বা উপকূলভাগ সাবধানে রক্ষা করার মত যথেষ্ট রণতরী বা বিমান না থাকলে স্বতন্ত্র কথা; যেমন ১৯৪২এর প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে হয়েছিলো।

কনভয়ে যাবার মোটামুটি এবং সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, প্রথমতঃ, বন্দরের বাইরে জাহাজগুলি বেরিয়ে পড়বার আগে সম্মুখের জলভাগের

অনেকটা অংশ ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রা। তারপর মহাসমুদ্রে পড়ে নিয়ত পথ পরিবর্ত্তন। কখন উত্তরে ৫০ মাইল, পরে উত্তর পূর্ব্বে ৪০ মাইল, দক্ষিণে ৬০ মাইল আবার হয়তো পশ্চিমে ৩০ মাইল—এম্নি ধারা অদ্ভুত গতিতে অনুসরণকারী কেউ যদি থাকে, তাকে বিভ্রান্ত ক'রে দেওয়া। তাই সমুদ্রগর্ভের বিভিন্ন অংশের সাবমেরিনগুলি কনভয় আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোথায় কখন মিলিত হবে, স্থির করা ওদের পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। হয়তো এ'রা সংবাদ পেলো, মস্ত এক কনভয় বিশিষ্ট একটি অক্ষরেখার কাছাকাছি দিয়ে পূর্ব্বমুখে বৃটেনের দিকে যাচ্ছে। কনভয়ের তখনকার গতির হিসাবে ৩০০ মাইল পূর্ব্বে সেই অক্ষরেখার কাছাকাছি পৌঁছুতে এ'র যে সময় লাগবে, সেই সময়ের ভেতর বিভিন্ন সমুদ্রাংশ থেকে সাবমেরিনগুলি সেখানে গিয়ে অপেক্ষায় রইল। কিন্তু কনভয় ইতিমধ্যে গতি ও গতিমুখ বহুবার পরিবর্ত্তন করবে। বিশিষ্ট অক্ষাংশটি ধ'রে পূর্ব্ব দিকে ৫০ মাইল গিয়ে হয়তো সোজা দক্ষিণে ৪০ মাইল গিয়েছে, পরে আবার হয়তো পশ্চিমেই ২০ মাইল এসে পূর্ব্বদক্ষিণ কোন ধরে ৬০ মাইল গিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গতিরও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। যে দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষাংশের কাছাকাছি সাবমেরিনগুলি যে সময় এ'র প্রতীক্ষায় রয়েছে তার হয়তো অনেক পরে কনভয়টি ওদের সঙ্গে ৬০০।৭০০ মাইল ব্যবধান রেখে বেরিয়ে চ'লে গেল।

আক্রমণকারীরা স্বভাবতই এসব রীতি জানে। তাদেরও প্রতিনিয়ত নানাভাবে সমুদ্রের বিশালতার মধ্যে কনভয় অন্বেষণের পদ্ধতি বদলাতে হয়। উভয় পক্ষের এই লুকোচুরী খেলার মধ্যে কখন কোনও কনভয় সাবমেরিনের ঝাঁকের ভেতর পড়ে গেল! কনভয়ে তাই নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে, আক্রমণ সুরু হ'লে সব জাহাজ দল ভেঙ্গে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে

পড়বে। আক্রমণ তীব্র হ'লে জাহাজগুলি বিভিন্নপথে গন্তব্যলক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে, কিছু অন্ততঃ গিয়ে পৌঁছুবেই।

বিচিত্র গতিতে এ'ভাবে কিছুদিন চলবার পর আমরা এসে পড়লাম ২০° ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার কাছাকাছি। স্থানটি তখন নাবিকদের নিকট বিশেষ ত্রাসপূর্ণ। শত শত বাণিজ্যতরী এখানে নাৎসী আক্রমণে নিমজ্জিত হয়েছে, সহস্র সহস্র বিভিন্ন দেশীয় নাবিক অকালে এখানে প্রাণ হারিয়েছে। মানচিত্র দেখলেই কারণ অনুমান করা কঠিন হবে না। স্পেনের ও আয়ার্লণ্ডের উপকূল হ'তে কিছু দূরে এই অঞ্চল সহজেই নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্সের উপকূলবর্ত্তী সাবমেরিন ঘাঁটিগুলির মধ্যে রক্ষিত সাবমেরিনগুলির গতি সীমার মধ্যে পড়ে। সাধারণতঃ সাবমেরিন ৫০০ হতে ৮০০ টনের মধ্যে হ'য়ে থাকে। এই ক্ষুদ্র জাহাজটির ভেতর নিতে হচ্ছে, মানুষ, খাদ্যসামগ্রী, রণসম্ভার, তেল এবং আরো অনেক কিছু জিনিষ। তাই বহুদিন পর্য্যন্ত সমুদ্রে ঘোরাফেরা করবার সামর্থ্য এদের নেই। অনুসন্ধানকারী বিমান বা অন্য কোন সূত্রে এদের প্রসারিত বাহুর মধ্যে কোন কনভয়ের এসে পড়বার সংবাদ পেলে এই ছোট সাবমেরিন-গুলি পোতাশ্রয়গুলি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাহাজগুলির ওপর হানা দেবার চেষ্টা করে। যে সব সাবমেরিন বহুদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমুদ্রে শিকারের সন্ধানে ফেরে, সেগুলি বৃহদাকার এবং সংখ্যায় খুব কম। এরা দেশে না ফিরে ক্রমাগত ধ্বংশকার্য্য চালিয়ে যেতে পারে এক বৎসর পর্য্যন্তও— সরবরাহকারী সাবমেরিনগুলি এদের এই সময়ের মধ্যে এসে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিষপত্র সরবরাহ করে। এ' তথ্য মিত্রপক্ষের কর্ত্তারা বহুদিন পর্য্যন্তই জানতেন না।

এইখান থেকে রক্ষীজাহাজগুলি আরো সাবধান হ'ল। একখানা ভারী ক্রুজার এবং একটী বিমানবাহী জাহাজকে এখানে আমাদের সঙ্গে

এসে মিলিত হ'তে দেখা গেল। বোধ হয়, এই অঞ্চলে কেবল সাবমেরিন নয়, বিমান আক্রমণেরও বিশেষ ভয় আছে ব'লেই, নৌ-বিভাগ থেকে পাঠান হয়েছিলো এদের। সারাদিনই বিমানগুলিকে পালা কোরে আকাশে উঠে সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত টহল দিয়ে ফিরে আসতে দেখা যেতো। আকাশ পথের বিমানগুলি সাবমেরিনের মহাশত্রু। হয়তো, কোন স্থানে কোন সাবমেরিন সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে সামান্য কিছু নীচে বসে বাইরের সমুদ্র দেখবার জন্য পেরিসকোপের চোঙটি চার পাঁচ ফুট বের করে আছে; দূরে আকাশ থেকে কোন বিমান দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে সে জায়গার ওপরে বোমাবর্ষণ তো করবেই, জলের ওপর আপন দলের রণপোতগুলিকে জানিয়ে দেবে ঠিক জায়গাটির সন্ধান।

সকলকেই এই অঞ্চলটায় বেশ একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল। জাহাজের মধ্যে কোথাও কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে সবাই সেই এক প্রশ্ন করে, "মহাশয়, সাবমেরিনের খবর পেলেন কি?" আরও তিন চার দিন আছে এখনও বৃটেনের উপকূলে পৌঁছুতে। আকাশের অবস্থাও বেশ পরিষ্কার; আয়র্ল্যাণ্ড ছাড়িয়ে উত্তর দিক দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের দিকে যাচ্ছি। ঠিক পরের দিন 'লক ইউ' পৌঁছুব। সকাল প্রায় দশটায় অকস্মাৎ আকাশে শত্রুবিমানের আবির্ভাব। সংখ্যায় বেশী নয়, ছ'খানি। আকাশপথে মেসিনগানের টট্-টট্-টট্ আওয়াজ শুনে দেখি দু'খানা বৃটিশ বিমান এক জার্ম্মান বিমানের সঙ্গে লড়ায়ে লেগে গেছে। অন্য আর এক দিক থেকে চারখানা নাৎসী বিমান আসছে দেখা গেল। ক্রুজারখানি থেকে এবং কনভয়এর মধ্যে যে সব জাহাজে বিমানধ্বংসী কামান ছিল, সবগুলো থেকে কামান গর্জ্জে উঠল সঙ্গের অন্য জাহাজগুলিকে যতদূর সম্ভব আড়াল দেবার জন্য। বোধ হয় প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা দেখেই জার্ম্মাণ বিমানগুলি কয়েকটা বোমা এলোপাথারী ফেলেই

আকাশ পথে মিলিয়ে গেল। দু'খানা বিমানকে অনেক উঁচুতে আমরা ল্যাজ থেকে ধূম উদ্গারণ করতে করতে চলে যেতে দেখেছিলাম, দুটোই দেখা যাচ্ছিল যেন ক্রমেই নেমে যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলো কোন পক্ষের বোঝা যায় নাই।

কনভয়ের কমাণ্ডার জানালেন, আবার বিমান আক্রমণ সুরু হ'তে পারে। সকলে যেন সাবধানে থাকে। তার পরদিন সকালে 'লক ইউ' নামে স্কটল্যাণ্ডের একটি বড় এবং সুরক্ষিত নৌ-ঘাঁটিতে পৌছুলাম। ইতিমধ্যে আর কোনও উৎপাত হয় নাই।

সারা স্কটল্যাণ্ডের প্রধান উপদ্বীপটির গা ঘেঁসে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সাধারণতঃ, স্কচ্ ধীবরেরা এই সব দ্বীপে বাস করে এবং নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দ্বীপগুলির মধ্যে সমুদ্র সরু হ'য়ে এসে প্রবেশ করে অনেকটা হ্রদের মত দেখায়। এ'গুলিকে বলা হয় 'লক্'। এমনই একটি বিশিষ্ট লকের নাম 'হুউ'। এখানে জাহাজ এসে লঙ্গর করে রইল প্রায় দিন দশ বার। লকের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি পাহাড়ের সারির মধ্যে মধ্যে। ৯ই নভেম্বর এখানে আমরা পৌছি। তখন শীতকাল সুরু হ'য়ে গেছে। জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে বহুদূর বিস্তৃত সারি সারি অনত্যুচ্চ পাহাড়গুলির ওপর যেন সাদা তুলো ছড়ান। স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় খুবই সুন্দর ব'লে আগে শুনেছি—সে কথা মিথ্যা নয়। তবে এমন সারি সারি সুন্দর পাহাড় এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থা স্কটল্যাণ্ডেরই বিশেষত্ব নয়।

প্রায় সাতমাস পরে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় যখন একখানা জার্ম্মান ক্রুজারে বন্দী হ'য়ে জাপানে নীত হই, তখন সেখানকার একটি পোতাশ্রয়ের পাশাপাশি পাহাড়রাজি সুশোভিত যে অঞ্চল জাহাজ থেকে চোখে পড়ে, তা'ও আমাকে মুগ্ধ করেছিলো।

লক ইউতে থাকাকালীন বহুকাল পরে আবার জল থেকে সন্ত ধরা টাটকা মাছ খেলাম। বাঙ্গালীর ছেলে, এতদিন টাটকা মাছ না পেয়ে যেন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। জাহাজটির কাছাকাছিই দেখি, ধীবরেরা মাছ ধরছে। ষ্টুয়ার্ডকে ডেকে বললাম, "বদলাও তোমার এক ঘেয়ে ডিম, আর ঠাণ্ডা মাংস আর টিনে ভরা মাছ। কেনো এই টাট্‌কা মাছ।' দুঃখের বিষয় আমি নিজে কোন দিন রান্না শিখি নাই, না হ'লে নরউইজিয়ান বাবুর্চ্চি দিয়েই মাছের কালিয়া রেঁধে খেতাম ও খাওয়াতাম। কাজেই সেই ভাজা মাছই হ'ল। তা হোক, সেদিনকার 'সালমন' ভাজা ঠিক আমাদের রুই মাছ ভাজার মতই লেগেছিলো।

দু'তিন দিন এখানে জাহাজের ওপর থেকে অস্থির হয়ে উঠলাম। কাছে মাটি অথচ নামবার উপায় নাই, পাহাড়গুলির মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট উপত্যকায় লোকের ছোট ছোট বসতি। কাজেই মাটিতে নামবার সুবিধা নাই। কনভয়এ যে সব জাহাজ এসেছে, তাদের মধ্যে যে-গুলোর দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড গন্তব্যস্থল, সেগুলো একদিন নতুন এক উপকূল-কনভয়ে রওনা হয়ে চলে গেল। আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে উত্তরগামী কনভয়ের জন্য।

একদিন দুপুরে হঠাৎ নৌ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী এসে খবর দিয়ে গেল, সেইদিনই বিকেল ৩টার সময় লক্ ছেড়ে আমাদের জাহাজটিকে স্কটল্যাণ্ডের উপরিভাগ প্রদক্ষিণ করে গন্তব্যস্থলে যেতে। কনভয় যাবে না। ইংল্যাণ্ডের সেদিন এমনি দুরবস্থা, যে, সকল জাহাজকে কনভয়এ নেবার মত তার যথেষ্ট উপযুক্ত রণতরী ছিল না। তবে, স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে বৃটেনের বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি স্কাপা-ফ্লো আমাদের পথে পড়বে। জার্ম্মান বিমানগুলিও রাজনৈতিক কারণে আক্রমণের তীব্রতা অনেকটা ইংল্যাণ্ডের ওপর নিবদ্ধ রেখেছিল। পরে দেখছি এবং 'এডিনবরা' ও 'লিথ'-এর

স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে শুনেছি, ওসব জায়গায় তেমন উল্লেখযোগ্য বিমান আক্রমণ একেবারেই হয় নাই। 'লিথ'-এর ডক্‌গুলির ওপর ও এডিনবরাতেও দু'একবার যৎকিঞ্চিৎ বোমাবর্ষণ হয়েছিলো। সে রাতে 'স্কাপা ফ্লো' পেছনে রেখে দক্ষিণমুখো হয়েছি—সে কি ঝড়! উত্তর সাগরের ঝঞ্চা উত্তর অ্যাটলান্টিকের চেয়েও যেন শক্তিশালী, জাহাজ কিছুতেই এগোতে পার্‌ছে না। দূরে একটি ডেষ্ট্রয়ার উপকূল রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল, আমাদের জাহাজটিকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে পরিচয়াদি নিয়ে নিকটেই একটি পোতাশ্রয়ে যেতে দিল। সে রাত্রি সেখানেই কাটল। সকালে ঝড়ের কিছু উপশম হ'লে রওয়ানা হ'য়ে বেলা প্রায় ২টার সময় 'মেথিল'এর নৌ-ঘাঁটিতে পৌছুলাম। এখানে আসতে অনেকগুলি ভাসমান মাইন এড়াতে হয়েছিলো।

সমুদ্রতটে 'মেথিল' স্কটল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট শহর—ঠিক সামনেই খুব চওড়া 'বে' থাকার জন্য বহু জাহাজ থাকতে পারে, তাই এ'টি একটি নৌ-কেন্দ্র হয়েছে।

নৌ-বিভাগের অফিসে আমাদের আগমন সংবাদ দেবার দু'দিন পর জান্‌তে পারলাম, আমাদের জাহাজের মাল নামাতে হবে লিথ বন্দরে। সকালে মেথিল ছেড়ে সেদিনই বিকেলে লিথ পৌছুলাম। ৩০শে জুন কলকাতা ছাড়ি, আজ প্রায় পাঁচ মাস পরে পৃথিবীর সকল মহাদেশের মাটি ছুঁয়ে এতদিনে বৃটেনে এলাম।

ইমিগ্রেশন কর্ম্মচারীদের হাঙ্গামা শেষ হ'লে বেরিয়ে পড়লাম সহরে। কঠোর আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় ঘন কৃষ্ণতার আবরণ সন্ধ্যার পরেই সমগ্র সহরটির ওপর নেমে এলো। নতুন জায়গা—রাত্রিতে জাহাজে ফেরবার সময় পদে পদে হোঁচট খেয়ে মনে হচ্ছিল, এ' অন্ধকারে রাস্তার অন্ধ মানুষগুলি চলাফেরা করছে কি করে? রাস্তায় ইংল্যাণ্ডের, এ দেশে

বহু প্রশংসিত, পুলিসের নাম গন্ধও কোথাও নেই। একটি চৌ'মাথার আমরা তিনজন ভুল ক'রে অন্য পথ ধরে প্রায় ঘণ্টাখানেক এগিয়ে সন্দেহ হ'ল হয়তো রাস্তা হারিয়েছি। আবার ফিরে সেই চৌমাথায় এসে স্থির করতে পার্চ্ছি না, কোন দিকে ডকে যাওয়া যায়। সঙ্গীদের একজনকে বল্‌ছি, কি আশ্চর্য্য, কোন পুলিস দেখছি না কোথাও তো। তা হ'লে তো কোন গোলই হ'ত না। সে হেসে উত্তর দিল, ব্ল্যাক-আউট হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ব্ল্যাক-আউট হয়েছে আর কি! পুলিস আবার কোন দিন কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় নাকি? ঘুষ খোর সব। আমি অবাক্! এত কথা শুনেছি, এখানকার এদের সততা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে!

সৌভাগ্যক্রমে, অন্ধকারের মধ্যেই দেখি একটি লোক যেতে যেতে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস্ করল, আমরা এখন জাহাজেই যাচ্ছি নাকি? লোকটি আমাদের জাহাজেরই এক নাবিক। লিথ-এ আগেও অনেকবার এসেছে, পথ-ঘাট ভাল করেই জানে। সবাই একসঙ্গেই ফিরলাম।

আমেরিকার আলোকমালা সজ্জিতা নগরীর পর, অ্যাটলান্টিকের এপারে এই অন্ধকারের রাজত্ব, পৃথিবীর এই প্রান্তে আসন্ন তমসাযুগের চিত্র যেন তুলে ধরেছে। ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত!

চার্চিল-কিপলিংএর দেশে

যুদ্ধের প্রথম দিকেই ইংল্যাণ্ডের নগরীগুলি যখন কেন্দ্রীভূত নাৎসী-বিমান আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল, ভারতবর্ষে বসে আমরা শুনতাম বৃটিশ জনসাধারণের অভূতপূর্ব্ব স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও বীরত্বের কথা। কভেণ্ট্রীর অস্তিত্ব নাৎসী বোমায় একেবারে লুপ্ত হয়েছিলো বললে অত্যুক্তি হবে না, অন্যান্য সহরেও অল্পবিস্তর যথেষ্ট প্রাণহানি হয়েছে। লণ্ডনের বিশালত্বের জন্য বিমান আক্রমণের ক্ষতগুলি কভেণ্ট্রির মত অতটা ভীষণ দেখাত না।

তার পূর্ব্বে রটার্ডাম্ ও ওয়ারশ'র ওপর বিমান আক্রমণের বীভৎসতার সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে পেয়েছিলাম। কিন্তু নাৎসী বিমান আক্রমণের সময় তত্রত্র অধিবাসীদের আচরণ-কাহিনী প্রচারিত হবার পূর্ব্বেই দেশগুলি জার্ম্মেনীর কুক্ষিগত হওয়ায় অ-নাৎসী জগৎ হ'তে পৃথক হ'য়ে পড়ে।

আরও কিছু আগে, স্পেনের গৃহ যুদ্ধের সময় এ যুদ্ধের নব নীতির কার্য্যকারীতা ঘরোয়া লড়াইয়ের আড়াল নিয়ে যখন পরীক্ষিত হচ্ছিল তখনও মাদ্রিদ প্রভৃতি সহরের অধিবাসীদের দৃঢ়তা ও ধীরতা জগতের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। শেষ পর্য্যন্ত, জার্ম্মানী ও ইতালীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধতায় এবং ছদ্ম মিত্রদের ক্রমান্বয় বিশ্বাসঘাতকতায় স্পেনের গণশক্তির পতন হ'ল। মাদ্রিদ, বার্সিলোনা থেকে একটি চূড়ান্ত শিক্ষা পাওয়া গেল। প্রথম বিমান আক্রমণের সময় জনসাধারণ একটু বিশৃঙ্খল হয় বটে, কিন্তু বিমান আক্রমণ নিয়ত চলতে থাকলে জনগণ তা'তে অভ্যস্ত

হ'য়ে পড়ে, আক্রমণ কালে বেশ শান্তভাবেই আড়াল নেয় এবং শেষ হ'য়ে গেলে বৃথা হৈ চৈ না ক'রে আপন আপন কাজে মন দেয়। আরও পাঁচ রকম প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মত এ জিনিষটাও তাদের নিত্যকার জীবনে অভ্যাস হয়ে যায়।

কারণ—উপায় নাই। ইংল্যাণ্ডে নাৎসী বিমান আক্রমণের সময় জনসাধারণ এই প্রথম বহু শত বৎসর পর নিজ গৃহে যখন যুদ্ধের বীভৎসতার নগ্নরূপ দেখ্‌তে সুরু করল, ইংল্যাণ্ডের প্রচার বিভাগ সারা পৃথিবীময় এই কথা প্রচার আরম্ভ কর্‌ল, ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ ব'লেই নাৎসী আক্রমণের তীব্রতা তারা সহ্য কর্‌তে পারছে, অন্য কোন দেশ হ'লে এতদিনে পতন ঘটত। "হিটলারের বোমা সত্ত্বেও আমাদের কাজ যথারীতি চলবে" কয়েকটি দোকানে লাগান এই বিজ্ঞপ্তি ছায়া চিত্রে প্রতিফলিত ক'রে মিত্র পক্ষের সকল দেশের জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা হ'ত। এ সম্বন্ধে সকল কথার মধ্যে তখন সেই একই রেশ প্রতিধ্বনিত হ'ত শত্রুর নির্ম্মম আঘাত সহ্য করেও দাঁড়িয়ে থাকবার মত সহনশীলতা ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে যেমন আছে এমনটি আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

যুদ্ধকালীন ইংল্যাণ্ডে দু'মাস থেকে সেখানকার স্বাভাবিক জীবনে দোকানপাট ও অন্যান্য বাহ্যিক জিনিষ দেখে নিরাপদে ভারতে ফিরতে পারলে হয়তো আমারও সেই ধারণাই হ'ত। তবে দেশের মধ্যে বিয়ারের ছড়াছড়ি দেখে এবং বহু বৃটিশ নরনারী আপন আপন সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে রাত দশটা পর্য্যন্ত বিয়ার পার্লারগুলিতে মাতলামী করা সম্বন্ধে কয়েকখানি সংবাদ পত্রে যে কঠোর সমালোচনা চলছিল, একদিন কথাচ্ছলে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোকের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি বল্‌লেন, বিয়ারের এই আতিশয্য ও নৈতিক শ্লথতা যুদ্ধের ফলেই হয়েছে, চীন দেশে যেমন আফিম খাইয়ে দুষ্টেরা জনসাধারণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার

চেষ্টা করে এসেছে, এখানেও যেন তেমন-ই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। উপর্য্যুপরি পরাজয়ের অবসাদ জনগণকে আচ্ছন্ন না করতে পারে।

বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে পরে দেখি, জনসাধারণ সকল দেশে সকল কালে একইরূপ। ১৯৪৪।৪৫ সালে রেঙ্গুনে যখন মিত্রপক্ষীয় বোমাবর্ষী বিমানগুলি যথেচ্ছভাবে এলোপাথারী বিস্ফোরক বোমা বর্ষণ ক'রে রেঙ্গুনের প্রধান ভারতীয় মহল কালাবস্তীকে শ্মশানে পরিণত করেছিলো তখনও সেখানকার অধিবাসীদের অযৌক্তিক ভীতিগ্রস্ত হ'তে দেখি নাই। ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় 'সাধারণ' নরনারী অনেকে মিলে একটা জায়গায় হয়তো নাচ গান করছে, আসন্ন বিমান আক্রমণের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল, আকাশ পথে বিমানও আস্‌ছে দেখে সবাই বেশ ধীরে সুস্থে, কোনও রকমের 'হায় কি হ'ল' না ক'রে, আপন আপন গর্ত্তে গেল সঙ্গের বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে। আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা কাল প্রবল বোমাবর্ষণ ও বিমান বিধ্বংসী কামান গর্জ্জনের পর 'সব পরিষ্কার' সঙ্কেত যখন এল, সবাই এরা আবার নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব স্থানে ফিরে এসে নাচ গান বা অভিনয় যা হচ্ছিল, চালাতে সুরু করল।

ইংল্যাণ্ডে নাৎসী বিমান হানার জন্য সহস্র সহস্র নাগরিক হতাহত হওয়া সত্ত্বেও যে জনসাধারণ তদ্‌কালিন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় নাই, এই তথ্য উপলক্ষ্য করে তখন নিয়ত দেখাবার চেষ্টা হ'ত, সেখানকার জনসাধারণের অন্য দেশের তুলনায় অতুলনীয় দেশ-প্রেম ও সহনশীলতা!

বহু শত বর্ষব্যাপী ভারতের এই তামসিক যুগে বৈদেশিক প্রচারে বিভ্রান্ত ভারতবাসী অনেক সময় তাই নিজেকে অন্য দেশের তুলনায় হীন মনে ক'রে বসে। কেউ কেউ তো ইংরাজের নিয়মিত আহারের মধ্যেও ভয়ানক একটা সাহসই দেখে ফেলে! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী

হ'তে দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা আসে না, ছুটতে হয় জাপানীর দৃষ্টান্ত দেখে দেশকে ভালবাসতে শিখ্‌তে। নিজ পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য কর্তৃক পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ থেকে যবন বিতারণ মনঃপূত হয় না—চাই ম্যাজিনি গ্যারিবল্ডী!

কিন্তু ঠিক যে কারণে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা এ যুদ্ধে তাদের সহস্র প্রকারের ক্ষতি সত্বেও জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো কর্‌তে পারে-ই নাই, বরং জাপানীদের সমস্ত যুদ্ধকালীন বিধি মেনে চল্‌ছিল, সেই একই কারণে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণকেও সব সহ্য কর্‌তে হচ্ছিল।

ভারতবর্ষের জনসাধারণকে 'শিক্ষা' দেবার নামে জ্ঞানে এবং অজ্ঞানে এক শ্রেণীর লোক শত শত গল্পে, প্রবন্ধে এবং আরও বহুবিধ রচনায় নিয়ত এই একই মিথ্যা দ্বারা অভিভূত করছে যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান বা অন্য দেশের লোক ভারতবাসী হ'তে উৎকৃষ্টতর। তাই এ কথার অবতারণা।

লিথ বন্দরে যতদিন ছিলাম কোনও রকমের বিমান উৎপাত হয় নাই। এডিনবরায় দু'চার জন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। ওখানে ডাক্তারী পড়া শেষ করেছে, সমুদ্রে বিপদের জন্য দেশে ফিরতে পারছে না।

সপ্তাহ দুই পরে লিথ ছেড়ে নিউক্যাসেল রওয়ানা হ'লাম। সাউথ-শিল্ড আর এক নৌ-ঘাঁটি। এখানে তিন দিন কাটল। বহু জাহাজ এ স্থানে লঙ্গর করা থাকে প্রায় সব সময়েই, অনেক রণতরীও। প্রতি সন্ধ্যায় এবং রাতে জার্ম্মাণ বিমান এখানে আস্‌ত জাহাজ ঘায়েল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। রণতরীগুলির বিমানধ্বংসী কামানগুলি থেকে তখন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সুরু হ'ত, বিমানগুলি নীচে নেমে এসে লক্ষ্য স্থির কর্‌তে পারত না। তা ছাড়া বহু বেলুনও এখানে উড়িয়ে রাখা হ'ত। বহু ইস্পাতের তার ঝুলত বেলুনগুলি থেকে, যাতে কোন বিমান নীচে আসতে গেলে

তারের জালে আটকে নষ্ট হয়। নাৎসী বিমানগুলি অবশ্য অনেক সময় এই সব বেলুন আগে মেসিনগানের গুলি দিয়ে নষ্ট করে নীচে নেমে আসত। এখানে কিছু কিছু জাহাজ নাৎসী আক্রমণে নষ্টও হয়েছে। দ্বিতীয় রাত্রের বিমান হানার সময় পর পর দু'টি বোমা আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে পড়েছে। সামান্য জখমও হয়েছে জাহাজখানা এবং দু'চার জন নাবিক, কিন্তু মোটের ওপর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। টাইন নদীর ওপর অল্পবিস্তর বিমান আক্রমণ প্রায় সব সময়েই আশঙ্কা করা যায়, তাই সাউথশিল্ড থেকে নিউক্যাসেল পর্য্যন্ত দুখানা ডেষ্ট্রয়ারের রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল।

একাদিক্রমে পাঁচমাস কাল পৃথিবীর প্রায় সকল সমুদ্র ভ্রমণের পর জাহাজখানিকে আবার সমুদ্রোপযোগী করবার জন্য 'শুষ্ক ডকে' যাবার খুবই প্রয়োজন। তাই নিউক্যাসেলের সোয়ান হাণ্টারের 'শুষ্কডকে' আমাদের জাহাজখানি প্রবেশ করল মাস দেড়েক বিশ্রাম ও মেরামতের জন্য—আমিও ট্রেণ যোগে লণ্ডন, গ্লাসগো প্রভৃতি দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক বই-ই বাংলায় আছে। এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ করে, আমার দুর্ভাগ্য, সহস্র চেষ্টা করেও ওখানকার সাধারণ লোকের মধ্যে এমন কোন গুণ দেখি নাই যা' ভারতীয় চরিত্রে নাই। অনেক জিনিষ বিপরীতই লক্ষ্য করেছি। পৃথিবীর অন্য যত জাতির নিবিড় সংস্পর্শে এসেছি এদেরও ঠিক তেমনই লেগেছে—ভাল মন্দ মিশ্রিত। ভারতবর্ষের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের যে শ্রেণীর লোক এ দেশের বুকের ওপর চেপে বসে আছে, মুষ্টিমেয় দুর্ব্বৃত্ত তারাই ও দেশের জনসাধারণকেও মিথ্যা শিক্ষা ও আইনের শৃঙ্খলে বেঁধে উৎপীড়ন করছে। অনেক অনভিজাত লোকের

মুখেই শুনেছি "যুদ্ধ শেষ হোক্, ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ আর অনাহার সহ্য করবে না।" কিন্তু তার দৌড় ঐ লেবার পার্টির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত !

ইংল্যাণ্ডেও কেরানীকুলের দুর্দ্দশা ঠিক এখানকারই মত—গড়ে বেতন ৫০।৬০ টাকার বেশী নয়। মুখে দীনতার নত চক্ষু—পরণে বহুছিদ্র ট্রাউজার। ভারতবর্ষের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত ওরাও শত দুর্দ্দশা সত্ত্বেও চেয়ে থাকে ওপরের দিকে। এদেশেরই মত নিতান্ত অসার ব্যক্তি পূজারী এখানকার এই শিক্ষিত কেরানী, স্কুল মাষ্টার, ডাক্তার, আইনজ্ঞ প্রভৃতি। গণশক্তির ওপর অপরিসীম ঘৃণা, যদিও সুসংবদ্ধ অর্থহীন বাক্যবিন্যাসে নিপুণ। চার্চ্চিল, চেম্বারলেন বা বড় জোর এটলির গ্রামোফোন সব।

লিথ ও নিউক্যাসেল এই উভয় বন্দরেই জাহাজ পৌঁছুবার পর সেখানকার 'সিকিউরিটি সার্ভিসের' দুজন অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। না, বিশেষ কিছু না, এই এলাম তোমার কাছে। অনেক জায়গা ঘুরেই তো এলে, কি দেখলে অন্যান্য বিদেশী বন্দরে, আমাদের সম্বন্ধে সে সব জায়গার মনোভাব,—এই ধরণের সব কথা। আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন এ কথা সে কথার পর, নরউইজিয়ানরা কেমন লোক, অনেক দিনই তো কাটালে ওদের সঙ্গে এ জাহাজে, নাৎসীদের ওপর গোপন সহানুভূতি ওদের আছে নাকি ইত্যাদি ইত্যাদি—বলতে বাধ্য হলাম, আমি এ' জাহাজেরই একজন কর্ম্মচারী। আমাকে এ ধরণের প্রশ্ন করতে তাদের লজ্জা অনুভব করা উচিত ছিল, এবং পাল্টা প্রশ্ন করলাম, এতদিন এ জাহাজে আছি, জিজ্ঞেস কর নাই আমার নরউইজিয়ান সহকর্ম্মীদের আমি কেমন লোক ? ব্রিটিশ সম্বন্ধে মনোভাব কিরূপ, এসব ? না, না, হ্যা, হ্যা, সে কি কথা, আমরা তোমরা তো একই, এই ধরণের আবোল তাবোল বকৃতে বকৃতে আস্তে আস্তে তারা বিদেয় হ'ল। দিন দুই পরে সন্ধ্যাহারের সময় কাপ্তেনের কাছে শুনি তাঁকে ও সেকেণ্ড

অফিসারকে ওরা ইতিমধ্যে ঠিক ঐ সব কথাই জিজ্ঞেস করেছিলো এবং মুখের মত জবাবও পেয়েছিলো।

একদিন বাইরের একটা রেস্তোরাঁতে তুজন নরউইজিয়ান বন্ধুর সঙ্গে বসে আছি, আর এক টেবিলে তিনটি ইংরাজ ভদ্রলোক। নিতান্ত অযাচিতভাবে তাঁদের একজন উঠে এসে আলাপ সুরু করে দিলেন, মাপ করবেন, হয়তো আপনাদের বিরক্ত কর্ছি, বলতে বলতে এসে সামনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসেই পড়লেন। তাই বলতে হ'ল, বিলক্ষণ, বসুন, বসুন।

ভদ্রলোক আমাদের আপ্যায়িত করে দিলেন। গায়ের কোটের ওপর 'এপুলেট'এর দিকে চেয়ে নিজেই কারণ দিলেন। "আপনারা নৌ-কর্ম্মচারী, তাই একটু আলাপ করতে এলাম। এ তুর্দ্দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রকৃত বিদেশী বন্ধু আপনারাই ইত্যাদি ইত্যাদি।" আমাদের প্রায় প্রত্যহই দেখেন ওখানে, তাই ইচ্ছে হ'ল…… আমার বন্ধুরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বলেন, তাঁর যেন সুবিধে হ'ল না, আমাকে নিয়েই পড়লেন।

পরের দিনও ঠিক সেইখানে দেখা, যুদ্ধের পরিস্থিতির কথাবার্ত্তা হ'ল, সোভিয়েটের প্রশংসা করতে করতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্লেন। আবার তুদিন পরে দেখা, সেদিন আমি একা। সুরু করলেন নানা কথা,—যুদ্ধ, সমাজ, এবং আরো অনেক কিছু। হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, যুদ্ধটা হয়ে যাক্, গভর্ণমেণ্ট এখন আমাদের জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধ শেষে গভর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব্বের মতই জনসাধারণকে তুর্দ্দশার মধ্যে রাখে তো দেখা যাবে।

লোকটি কি পাগল? পাগলামী হ'লে এর ভেতর যেন একটা সুসংবদ্ধ প্রণালী রয়েছে। সারা য়ুরোপ তখন নাৎসী কবলিত। নাৎসী অধিকৃত

দেশগুলির যে সব জাহাজ তখন পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র বক্ষে ছিল, সেগুলি আর দেশে যেতে পারে নাই, উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল এবং সুয়েজের মুখের ইংরাজ রণতরীগুলির জন্য। গৃহে, নাৎসী অধিকৃত স্থানগুলিতে, নাবিকদের প্রায় সকলেরই আত্মীয়, প্রিয়জন আছে। এদের সংবাদ এই সব হতভাগ্যেরা কিছুই জানে না বহুদিন পর্য্যন্ত। এদের মনও তাই দেশের দিকে পড়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক। নাৎসী প্রতাপ তখন অপরিমিত। যেখানেই মিত্রপক্ষ জার্ম্মেনীর সম্মুখীন হবার চেষ্টা করেছে সেইখানেই তারা চূর্ণ হয়েছে। ঐ সব নাবিক ইংল্যাণ্ডের বন্দরগুলিতে আস্‌ছে, আবার কত নিরপেক্ষ বন্দরে যাচ্ছে, কে জানে এদের কার মনের অন্তরতম প্রদেশে কি আছে—বৃটেনের গোয়েন্দা বিভাগের কাজ অকস্মাৎ ভয়ানক রকম বেড়ে গিয়েছে। অনভিজ্ঞ শত শত নতুন লোককে তাই এ কাজে নেওয়া হয়েছে।

আসবার পথে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে একদিন কাপ্তেন আঙ্গুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখাতে দেখাতে বলছিলেন, জান গুপ্ত, ঐ ওপারে, মাত্র দু'দিনের পথ এখান থেকে নরওয়ে।

আগেই শুনেছিলাম, পাছে সমুদ্রে নাৎসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাই বহু নরউইজীয়ান বেতার কর্ম্মচারীকে ইংল্যাণ্ডে অন্তরীণ ক'রে রাখা হয়েছে। অবশ্য এ সব কথা কোন দিনই সংবাদপত্রে বের হ'তে দেওয়া হয় নাই।

আবার, এদের সঙ্গে একক ভারতীয়, বিভিন্ন সমুদ্রে, বিভিন্ন দেশে, যুদ্ধের সময় ঘুরে বেড়াচ্ছি, অপরাধী ইংরাজ প্রকৃতির সন্দিগ্ধতা জেনেই সাবধানে চলতাম। ভদ্রলোক হয়তো অনেকের মত বাচাল অথবা আর কিছু। প্রশ্ন করলাম, কি করবে তোমরা, যদি তোমাদের কর্ত্তারা যুদ্ধের পর পূর্ব্বাবস্থাই বহাল রাখে?

একটু না ভেবে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, কেন? এইবার আমাদের হাতে অস্ত্র এসেছে, আমাদের ভ্রাতা পুত্রদের সকলেই কেউ এখন সেনা-বিভাগে বা নৌ-বিভাগে বা বায়ু বিভাগে আছে। রুশিয়ার মত আমরাও একটা বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেব।

যতদূর সম্ভব গম্ভীর হ'য়ে তাঁকে উপদেশ দিলাম, ছিঃ, ইংল্যাণ্ডের ঐতীহ্য নষ্ট করবে? বে-আইনী কাজ করো না। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে থাক,—গরমাগরম কথাও বলতে পার, কিন্তু সাবধান, বিদ্রোহ প্রভৃতি পাজী জিনিষের কথা মাথাতেও এনো না। বিদ্রোহ করে ফেললে গভর্ণমেণ্টের দমন করতে কতটুকু সময় লাগবে?

ভদ্রলোক বললেন, কখনই না—ইংল্যাণ্ডের সৈন্যরা কখনই আমাদের ওপর গুলি চালাবে না। বলেছি না তোমাকে? এবার এই যুদ্ধে প্রায় সব ঘর থেকেই কেউ না কেউ সেনাদলে বা অন্য কোন দেশরক্ষা বিভাগে আছে।

রহস্যভরে আবার বললাম, না, না, বৃথাই শান্তিভঙ্গ শুধু হবে। তোমাদের গভর্ণমেণ্টেরও যে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মত ভারতীয় মূর সৈন্য আছে, ভুলে গেছ সে কথা? শান্তিপূর্ণ ভাবে, তোমাদের লেবার পার্টির ফতোয়া মেনে আন্দোলন করে যেতে থাক, আজ না হয় একশ' বছর বাদেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যেতে পারে!

অকস্মাৎ একজন বিদেশীর কাছে এত বাচালতা, এবং এই সময়ে? কিন্তু বৃটেনের জনসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার ওপর অতি তীব্র একটা অসন্তোষের ভাব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। লেবার পার্টির প্রভাব যতদিন আছে, এ অসন্তোষ বহ্নি থেকে ইংল্যাণ্ডের আভিজাত্য নিরাপদই থাকবে। তারপর কিছুকাল বাদে আবার একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়ে জনসাধারণকে একটা মত্ততার মধ্যে রাখলেই চলবে—কিন্তু

কতদিন? ভারতে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন সামাজিক আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সোল এজেণ্টগণ ভস্মীভূত হবেন, তারপর আর ক-ঘণ্টা বা কতদিন ইংল্যাণ্ডের মাতব্বরেরা দলিত মথিত জনগণকে সংবরণ করতে পারবেন? প্রকৃতির প্রতিশোধ যখন নির্ম্মম হ'য়ে এদের ওপর পড়বে, এঁরাই তখন দেশ-বিদেশে পালিয়ে নাকিসুরে কান্না লাগাবেন।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি এডিনবরার একদিন এক স্কচ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময়। বলছিলেন, লিথ-এ আমরা এত চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার জন্য একটা উদ্যান করাতে পারলাম না। এ বিষয়েও নাকি পার্লামেণ্টের সম্মতি চাই। স্কচ্‌দের সংখ্যা সেখানে কম, তাই বহুদিন ধামাচাপা পড়ে থেকে থেকে এখন বলা হচ্ছে যুদ্ধটা আগে শেষ হোক্।

আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, ক্ষুদ্র একটা ব্যাপারের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট?

তিনি বল্‌লেন, তাইতো আমরা স্কটিশ হোমরুল চাই।

এসব ওদের ঘরের এক টুক্‌রো ঝগড়া—আমাদের কাছে অবান্তর। হিটলার এই স্কটিশ হোমরুল আন্দোলন থেকেই আশা করেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে একটা ঘোরতর গৃহবিবাদের সূচনা করাতে পারবেন। কিন্তু আসলে দেখা গেল অন্যরূপ!

১২ই ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি 'প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্' ও 'রিপাল্‌স্' মালয় উপদ্বীপের কাছে জাপানীরা নিমজ্জিত করেছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার প্রধান নৌ-ঘাটি পার্ল-হারবারে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে আমেরিকান নৌ-বহরের অনেক ক্ষতি করেছে। জার্ম্মানীও সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ওপর প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মাত্র দিন সাত আগে ইংল্যাণ্ডের নৌ-বিভাগ হ'তে জনসাধারণের মধ্যে বহু প্রচারিত, বহু চিত্রে সুশোভিত, এক পুস্তিকায় 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্'কে সমুদ্রে বৃটেনের আধিপত্যের রক্ষক ব'লে বর্ণনা করা হয়েছিলো। এই অতিকায় এবং নিতান্ত আধুনিক রণতরীটি ইংল্যাণ্ডের লোকের কাছে এক মহা গর্ব্বের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঠিক তখন জাহাজটি পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি করছে কেউই জানতো না। একেবারে ভারতবর্ষের ঘরের দুয়ারে তার এই পরিণাম! বৃটেনের সমুদ্রাধিপত্যের রক্ষককে একেবারে ভারতীয় জলেই অতলে যেতে হ'ল!

জাপান যে এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধে অংশ নেবে, কেউ ভাবে নাই। এ ঘটনা আমাদের কাছে এক নতুন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

কেবল উত্তর অ্যাটলান্টিক নয়, এখন হ'তে পৃথিবীর সকল সমুদ্রই বাণিজ্য জাহাজগুলির চলাচলের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক হ'য়ে উঠ্‌ল। মালয়ের কাছেই যখন ইংরাজ রণতরী বহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-জাহাজটিকে অন্য একখানিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতলে যেতে হ'ল, এখন থেকে সারা বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর জাপানী সাবমেরিন, বিভিন্ন ধরণের রণতরী ও বিমানগুলির ক্রীড়াক্ষেত্র হ'বে।

জানি, কেব্‌ল্ করে যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খবরই কলকাতা থেকে পাওয়া অসম্ভব, তথাপি সেখানে খবর নিলাম সকলেই ওখানে আছে কিনা। যদি কলকাতায় বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকে তবেই বাড়ীর সবাই বাইরে চলে যাবেন, নতুবা যুদ্ধের সামান্য আতঙ্কে তাঁরা যে কিছু করে বসবেন না, জানতাম। উত্তর পেলাম, সবাই ভালই আছেন এবং কলকাতাতেই।

জাহাজের সেলুনে বসে এই সব কথাই আলোচনা হচ্ছিল, আমার সহকর্ম্মীরা বল্‌ছিলেন, এ অবস্থায় সত্যিই আমি নিরাপদে ভারতে ফিরতে পারব কিনা? জাহাজের আহার্য্য সামগ্রী সরবরাহকারী ইংরাজ ভদ্র

লোকটিও আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'ওঃ মাভৈঃ, পীতবর্ণের জারজগুলিকে আমাদের রণতরী বহর গিয়ে কিছু কালের মধ্যেই সাফ করে দিয়ে আসবে।' কথাগুলি অবশ্য ওদেশের এক জন লেবার দলের এম, পি'র প্রতিধ্বনি।

এই এম, পি'টি, জার্ম্মেনীর পক্ষে জাপানের যুদ্ধে যোগদানের বিষয় উল্লেখ করে সংবাদ পত্রে লিখেছিলেন, প্রাচ্যের এই ক্ষুদে পীত মর্কটের যুদ্ধে যোগদানে হিটলারের কোন সুবিধেই হবে না।

শ্লীলতার অপূর্ব্ব উদাহরণ!

ইংল্যাণ্ডে বসেই "প্রাচ্য মর্কটদের" ক্রীয়াকলাপের যে সব সংবাদ পাচ্ছিলাম, লোকটির সস্তা বীরত্বের সঙ্গে সেগুলি মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। বেশ একটু সন্দেহ রয়ে গেল নিকট ভবিষ্যতে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারব কিনা, অথবা একেবারেই সে কাজটি সমাধা হয়ে উঠবে কিনা?

আর এক ঝঞ্ঝাট—আমাদের জাহাজখানির সাধারণ বাণিজ্য পথ দক্ষিণ আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। এই প্রথম ভারতে গিয়েছিলো। তাই আমাকে দেশে আসবার বন্দোবস্ত করতে হবে নিউইয়র্ক গিয়ে। অন্য কোন নরওয়ের ভারতগামী জাহাজে কাজ নিয়ে অথবা যে কোন জাহাজে যাত্রী হ'য়ে। গৃহ বিপন্ন, জাপানীদের দ্রুত অভিযানে দেশে হয়তো কত বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে, এখন ত' দেশ ছেড়ে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। বন্ধুরা বললেন, বঙ্গোপসাগর এতক্ষণে নিশ্চয় 'নরক' হয়ে উঠেছে—তার চেয়ে যুদ্ধ শেষ না না হওয়া পর্য্যন্ত এসো এই উত্তর অ্যাটলাণ্টিকের জাহাজগুলোতেই কাজ করা যাক্। ভাগ্যে থাকলে, যুদ্ধ শেষে সবাই দেশে ফিরব।

জার্ম্মানী চেনা শত্রু। বহুকথিত, অল্পজানা বা অজানা শত্রুই মনের ওপর ভীতির ছায়াপাত করে অধিক। সকলেরই এক কথা। নাৎসীদের

মস্ত অসুবিধা ওদের সেরকম শক্তিশালী নৌবহর নাই। কিন্তু জাপানের রণতরী বহর যথেষ্ট শক্তিশালী। 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্'এর নাটকীয় সলিল-সমাধি সকলের মধ্যেই জাপানী সম্বন্ধে ভীতি খুবই বাড়িয়ে দিয়েছিল। তুলনামূলক সমালোচনা চলে, 'বিসমার্ক' ও সমুদ্রে 'বৃটিশ ইজ্জতের রক্ষকে'র নিমজ্জন নিয়ে। ওরা বলে, 'বিসমার্ক'কে ঘরের কাছে সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করতে গোটা 'উত্তর সাগর রণতরী বহর' ও বহু বিমানকে দিনের পর দিন নাজেহাল হ'তে হয়েছিলো, আর ঘৃণিত 'প্রাচ্য মর্কটেরা' তাদের দেশ থেকে বহুদূরে একমাত্র বিমান আক্রমণেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্'এর সমুদ্র জীবনের সমাধা করল! এই সব ধরণের কথা।

কিন্তু আমি স্থির করে ফেলেছি, যে দুর্য্যোগ দেশে আসন্ন—সেখানে যাবই। সহস্র সাবমেরিন বঙ্গোপসাগরে কেন্দ্রীভূত হ'লেও এবং জাপানী বিমান আকাশ ছেয়ে ফেললেও জাহাজ চলাচল একেবারেই বন্ধ হ'তে পারে না; দু' চারখানা গিয়ে পৌছুবেই। আমার জাহাজও এই দু'চার খানার অন্তর্গত হ'লেও হতে পারে তো! আর যদি ভারতবর্ষের সব বন্দরই বন্ধ হয়ে যায়, তবে তো যুদ্ধের ইতি!

১২ই জানুয়ারী প্রাতঃকালীন আহারের সময় কাপ্তেন বললেন্, তোমায় একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি গুপ্ত।

তবে কি 'আউষ্টের' ভারত গমন ঠিক হ'ল? একমাত্র শুভ সংবাদ তখন আমার কাছে ঐ বিপদসঙ্কুল ভারতপথ। অপেক্ষা করছি শুনতে সংবাদটি কি! তিনি সেই কথাই বল্লেন, 'কাল দুপুরে খবর পেলাম আমাদের আবার ভারতে যেতে হবে নিউইয়র্ক থেকে। কলকাতায় নয়—বোম্বেতে।' বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্য জাহাজের চলাচল এখন বন্ধ।

সুখবরটির জন্য ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আবার বললেন, সত্যিই কি তুমি জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক করেছ, দেশে পৌঁছে ? বোধ হয় মাসখানেকেরও বেশী বোম্বে, কলম্বোতে আমরা থাকব। তুমি কেন সে সময়টা কলকাতায় তোমার বাড়ীতে কাটিয়ে ফিরে এস না। জাহাজ ছাড়বার আগে আমি তার করে জানাব তোমাকে।

নিতান্ত বিদেশী, পৃথিবীর অন্য কোণে অবস্থিত একটা দেশের এই লোকগুলির সঙ্গে প্রায় আটমাসকাল একসঙ্গে থেকে এবং বহু বিপদ একত্র উত্তীর্ণ হ'য়ে এদের সঙ্গে কেমন একটা মনের বন্ধন গড়েছিল। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এদের ছেড়ে যাওয়া আমারও ইচ্ছা ছিল না। ভাবলাম, কলকাতায় যদি তেমন কিছু না দেখি এবং ইতিমধ্যে জাপানের ভারতমুখে অগ্রগতি থেমে যায়, তাই হবে। তাঁকেও সেই কথা বললাম।

যাত্রার আয়োজন সুরু হ'ল। ইংল্যাণ্ডের তখন রপ্তানী করবার অবস্থা নয়। কনভয়ের সব জাহাজ খালি যাবে নিউইয়র্ক বা হ্যালিফ্যাক্সে। ব্যালাষ্ট দিয়ে জাহাজ সমুদ্রে ভাসাতে হবে। ভারসাম্যতা রাখবার জন্য যতটা সম্ভব কয়লা নিয়ে, পাথরের কুঁচি বোঝাই করা হ'ল ডেকের ওপর।

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২, নিউক্যাসেল ছাড়লাম—নিউইয়র্ক পথে। ইতিমধ্যে উত্তর আটলান্টিকে নাৎসী আক্রমণের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। আরও সংবাদ পাচ্ছিলাম আমেরিকার ওপর যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে সাবমেরিন আক্রমণ সুরু হয়ে গিয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে মাত্র ১০০ মাইল মধ্যেও জাহাজ ডুব্‌ছে। ২০° ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার 'আতঙ্ক বৃটেনের বন্দরগুলি থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার বিভিন্ন বন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

টাইন্ নদীর ওপর জার্ম্মান বিমানগুলির উৎপাতও বেড়ে গেছে। খুব বড় ঝাঁকে এরা আসে না, একসঙ্গে চার পাঁচখানার বেশী নয়। কিন্তু যখন তখন আসে। সুবিধে পেলেই জাহাজগুলির উদ্দেশে বোমা ফেলে যায়। অনেক সময় জাহাজগুলির কোনও ক্ষতিই হয় না। কখন কখন দু'চারখানা নষ্ট হয় কিংবা জখম হয়।

এ'ও বোধ হয় নাৎসীদের 'স্নায়বিক যুদ্ধে'র অংশ বিশেষ। নিয়ত, চব্বিশ ঘণ্টা, মানুষকে একটা বিশ্রী অপেক্ষার মধ্যে রাখা। যা'তে ক্রমে এদের মধ্যে একটা অবসাদের ভাব এসে যায়, মনের ওপর ব্যাধির মত দুশ্চিন্তা চেপে থেকে এ'কে দুর্ব্বল করে দেয়।

নিউক্যাসেল থেকে টাইন্ নদী বেয়ে প্রথম গন্তব্যস্থল 'মেথিল'। পরবর্ত্তী যাত্রা সেখানকার স্থানীয় নৌ-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে হবে। দু'খানা ডেষ্ট্রয়ার ও আমরা খান চারেক জাহাজ চল্লাম টাইন্ নদী দিয়ে। আবহাওয়া তখন আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল—ঘন কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। বিমান আক্রমণ একেবারেই অসম্ভব। তবু খুবই সাবধানে চল্‌তে হচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে অনেক সময় নাৎসী বিমান জলের ওপর মাইন পেতে রেখে যায়। পিঁপের মত দেখতে ভাসমান মাইনগুলি সাবধানে চললে নজরে পড়ে, জলের কিছু নীচে নিমজ্জিত মাইনগুলি দেখা যায় না। মাইন-সম্মার্জ্জনী ছোট ছোট জাহাজগুলিকে প্রায়ই নদী ছেঁকে এগুলো সরিয়ে ফেলতে হয়—বাষ্পীয় শক্তিতে চলা জেলে জাহাজগুলি, সামনে এবং দু'ধারে শক্ত তারের জাল এঁটে মাইন-সম্মার্জ্জনী জাহাজ করা হয়েছে। সাধারণতঃ, নদীতে, নদীর মোহানায়, বে'তে, উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে, মাইন রাখা হয়। মাইন-সম্মার্জ্জনী ক্ষুদ্র জাহাজগুলোকে তাই প্রায়ই এ সব জায়গা পরিষ্কার করতে হয়। যদি কিছু থাকে এবং কোন একটির সঙ্গে লেগে যায়

কিন্তু বিজ্ঞান কোন দেশের বা জাতিরই একাকীর সম্পদ নয়। তা'ই যদি হ'ত, এক চুম্বক মাইনের প্রয়োগেই নাৎসী জার্ম্মাণী ইংল্যাণ্ডকে বাকী তুনিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে এবং অতি সত্বর এ' যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করতে পারতো। চুম্বক ও বিদ্যুতের যে ধর্ম্ম তাঁরা চুম্বক মাইনে লাগিয়েছেন, ঠিক তারই সাহায্যে নাৎসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই মাইনকে সংহত করে দিলেন।

কোন চুম্বকের ক্ষেত্রে লোহা বা ইস্পাত এসে পড়লে, সেই লোহা বা ইস্পাতও চুম্বকধর্ম্মী হয়। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের চুম্বকশক্তির ক্ষেত্র যতদূর পর্য্যন্ত কার্য্যকরীভাবে বিস্তৃত, তার ভেতর কোন ইস্পাতের জাহাজ এসে পড়লে মেরু হ'তে দূরত্বের পরিমাণ অনুযায়ী অল্পবিস্তর চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হবে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের চুম্বক শক্তি বিপরীত। উত্তর গোলার্দ্ধে উত্তর মেরুর চুম্বক ক্ষেত্রে সকল জাহাজ একই মেরুধর্ম্মী এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বিপরীত ধর্ম্মী। কাজেই উত্তর গোলার্দ্ধের জলরাশিতে অবস্থান কালে ইস্পাতের জাহাজগুলি যে মেরু ধর্ম্মী হবে, সেই চৌম্বিক শক্তির ক্ষেত্রের মধ্যে বিপরীত-মেরুধর্ম্মী স্বভাব প্রাপ্ত দ্বিতীয় কোন ক্ষুদ্র বস্তু থাক্‌লে, চুম্বক ধর্ম্মের বিধি অনুযায়ী বস্তুটি জাহাজের অঙ্গে প্রবলভাবে আকর্ষিত হ'য়ে অবশেষে, বিস্ফোরক পদার্থ পূর্ণ হ'লে, বিভ্রাট ঘটাবে। তাই যদি কোন মাইনের ডিটোনেটারের সঙ্গে এই বিপরীত মেরুধর্ম্মী কোন ব্যবস্থা রাখা যায় তবেই সে'টা চুম্বক মাইনে পরিণত হ'ল।

প্রতিষেধ ব্যবস্থা বা 'ডি-গস্' করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইস্পাতময় জাহাজের এই চুম্বক ধর্ম্ম নিবারণ করা। বৈদ্যুতিক-চুম্বক বিজ্ঞানের বিধি অনুযায়ী তামার তারগুলির মধ্য দিয়ে এমন গতিমুখে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত থাকবে যাতে বিপরীত ধর্ম্মী ও সমশক্তির আর এক চৌম্বিক ক্ষেত্র

সৃষ্ট হ'য়ে অবশেষে মেরুপ্রদেশ হ'তে প্রাপ্ত চৌম্বিক ক্ষেত্র এবং এই নতুন ক্ষেত্র উভয়ই বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

পৃথিবীর চৌম্বিক শক্তি মেরুপ্রদেশ হ'তে বিষুবরেখার কাছে ক্রমেই প্রায় অন্তর্হিত হ'য়ে আসে এবং এই রেখার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে কার্য্যকরীভাবে একেবারে অদৃশ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাত নির্ম্মিত জাহাজের চুম্বক ক্ষেত্রও দুর্ব্বল হ'তে দুর্ব্বলতর হ'য়ে ঐ অঞ্চলে একেবারেই থাকে না। তাই বিদ্যুৎ প্রবাহের গতিও ক্রমেই ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর কর্‌তে হয় এই 'ডি-গস' বন্দোবস্তে, এবং বিষুবরেখা অঞ্চলে বিদ্যুৎপ্রবাহ একেবারেই রুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। নতুবা বিদ্যুৎ প্রবাহ হ'তে সৃষ্ট চৌম্বিক ক্ষেত্র এ সব জায়গায় জাহাজের কাছাকাছি চুম্বক মাইন থাকলে বিভ্রাট ঘটাবে।

তারপর জাহাজ যদি বিষুবরেখা উত্তীর্ণ হ'য়ে পৃথিবীর অপর অংশে দক্ষিণ গোলার্দ্ধের মধ্যে ক্রমেই দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ মেরু হতে দূরত্বের ব্যবধান অনুপাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্রমেই বেড়ে যাবে; কিন্তু এবার এই প্রবাহের গতিমুখ উত্তর গোলার্দ্ধ হ'তে বিপরীত। কারণ দক্ষিণ গোলার্দ্ধে জাহাজের চৌম্বিক ক্ষেত্রও বিপরীত ধর্ম্মী।

এরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিদ্যুৎ প্রবাহের গতিমুখ ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাপের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা কষা একটি তালিকা জাহাজে দেওয়া হয়। তাই দেখে, বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে ও এই প্রবাহ আয়ত্তাধীনে রেখে পৃথিবীর সমগ্র সমুদ্র বক্ষে চুম্বক মাইনের গুরুত্ব নষ্ট করা হ'ল।

* * * * *

'মেথিল' পৌছুলাম পরের দিন। রেডিও অফিসার্‌স্ কনফারেন্সে কনভয়এর জাহাজগুলির মধ্যে যোগসূত্র রাখবার এবং প্রয়োজন হ'লে

একক ভ্রমণের জন্য নতুন ব্যবস্থা হ’ল। কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে অপেক্ষা করছি কাপ্তেনের জন্য। তিনি নিকটেই আর একটি হলে ক্যাপ্টেন্‌স্‌ কনফারেন্সে কি পদ্ধতিতে এবার উত্তর অ্যাটলান্টিক পার হ’তে হবে সেই পরামর্শে যোগ দিয়েছিলেন। একটু পরেই তিনি বেরিয়ে এলেন। সমুদ্র তীর থেকে দু’জনে একটা মোটর লঞ্চে জাহাজের দিকে যাচ্ছি, শুনলাম সেদিনই বিকেলে আমাদের ‘মেথিল’ ছেড়ে যেতে হবে। গতবারের মত এবারও বৃটেনের উত্তরগামী কনভয় যাবে না। সমস্ত রক্ষীজাহাজ দক্ষিণ দিকের উপকূল ভাগে ব্যাপৃত, সে দিকে জার্ম্মান বিমান, সাবমেরিন ও ই-বোটের আক্রমণ প্রায় লেগেই থাকে।

বেলা প্রায় ২টার সময় আমরা ‘মেথিল’ ছেড়ে উত্তরমুখে রওয়ানা হলাম। কাপ্তেন ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে পূব দিকে চেয়ে রইলেন—উত্তর সাগরের ওপারে তাঁর পরিজনবর্গ যেখানে আছে এখান থেকে দুদিনের পথ সেই নরওয়ের দিকে। যতটা সম্ভব প্রায় উপকূলের নিকট দিয়েই যাচ্ছি।

সন্ধ্যা প্রায় ৫টার সময় তীরবর্ত্তী বিমান আক্রমণ সতর্কী-করন কেন্দ্রগুলি থেকে সংবাদ পেলাম কতকগুলি জার্ম্মান বিমানকে উত্তর মুখে যেতে দেখা যাচ্ছে। রেডিও রুমের পাশেই চার্ট রুম ; কাপ্তেন সেখানেই ছিলেন। এই দু’টি ঘরের ভেতর কথাবার্ত্তা বলবার জন্য একটি মোটা রবারের নল আছে। তাঁকে বললাম।

বিমানবিরোধী ‘মেসিনগান’ ক্রু’-কে সতর্ক করে দেওয়া হ’ল। বিমান আক্রমণ যদি হয় এবং শত্রু যদি খুব নীচে নেমে এসে আঘাত হানবার চেষ্টা করে, তবেই এই মেসিনগানে ফল হবে। আর যদি এ’র সীমার বাইরে ওপর থেকে বোমা বর্ষণ করে, জাহাজ এঁকে বেঁকে তো চলবেই—আর আমাদের ভাগ্য।

মিনিট কুড়ি বাদে দ্বিতীয় সতর্কীকরণ সংবাদ এলো, উত্তর দিকের জাহাজগুলি সব সাবধান। কাপ্তেনকে আবার খবর দিলাম। তিনি সংশ্লিষ্ট অন্য অফিসারদের বললেন, ডেক ও ইঞ্জিনের নাবিকেরা সকলে যেন লাইফ জ্যাকেট প'রে থাকে। কাজ যেমন চলছিলো, চলতে লাগলো।

অন্ধকার হ'তে আর বেশী দেরী নাই। মোটা ইস্পাতের অন্তরালে মেসিনগানগুলির চালকেরা আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অপেক্ষায় আছে, কখন কোন মেঘের অন্তরাল থেকে কে অকস্মাৎ গুলি বর্ষণ করতে করতে বেরিয়ে আসে। অনেকক্ষণ কাট্‌ল। অন্ধকার আকাশ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। আবার সংবাদ এলো, সব পরিষ্কার, বিমানগুলি পূর্ব্বমুখে চলে গিয়েছে। সকলেই বুঝলাম আমাদের অনেক পশ্চাতে পরবর্ত্তী জাহাজগুলির জন্য কিছু মাইন ফেলে গেল।

গভীর নিশীথে আর কোনও কিছু হয় নাই। রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠে নিজের অফিসে যাচ্ছি, একটু দূরে উপকূল রক্ষী একটি ডেষ্ট্রয়ার আলোর সঙ্কেত ক'রে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে দেখলাম। 'স্কাপা ফ্লো'র নিকটবর্ত্তী হয়েছি আমরা। পরদিন সকাল সাতটা আটটা নাগাদ 'ইউ' লকে পৌছুব।

বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছি। কানাডিয়ান্ বয় প্রাতঃকালিন আহারের সময় দু-তিনবার ডাকতে এসে আমাকে গভীর নিদ্রাগত দেখে ক্যাবিনের ভেতর একটি ফ্লাস্কে গরম কফি এবং মাখন, রুটি, ডিম, পরিজ্ প্রভৃতি রেখে গেছে। ১২টার সময় মধ্যাহ্ন আহারের জন্য ডাক্‌তে এসে আমাকে সেই অবস্থাতেই আছি দেখে ওর যেন রোক চেপে গেল, খাওয়াবেই। আস্তে আস্তে ডাক্‌তে লাগ্‌লো—আপনি কি অসুস্থ? লাঞ্চের সময়ও যে হ'ল।

একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা অন্ধকার ঘরে যেন বন্ধ হ'য়ে আছি। দেওয়াল ধ'রে ধ'রে হাতড়ে হাতড়ে রাস্তা খুঁজছি বেরুবার জন্য, রাস্তাও পেয়েছি অন্ধকার একটা সরু বারান্দা দিয়ে। বাইরের আলোর দিকে যেমন বেরুবো একটা ভীষণাকৃতি কুকুর তাড়া করে আসে। উঠে দেখি 'বয়'!

'লক্'এ পৌছে'ছি কি?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'পৌছে দুটো আহার শেষ হ'তে চল্লো' সে বল্‌ল।

মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে বাইরে এসে দেখি, প্রায় শতাধিক জাহাজ কনভয়ে যাবার জন্য লকে অপেক্ষা করছে। তিনদিকে বহুদূর বিস্তৃত শৈলমালা তুষার অলঙ্কার ধারণ করে আছে। ছোট ছোট উপত্যকা-গুলিতে অধিবাসীরা দৈনন্দিন কাজ করছে। নিস্তব্ধ, শান্তিপূর্ণ এই অঞ্চলে উত্তর অ্যাটলান্টিকের ঝঞ্চার মধ্যে প্রবেশের জন্য অনেকগুলি মানুষ জাহাজগুলির মধ্যে অপেক্ষায় রয়েছে। নাৎসী আক্রমণ এখন চূড়ান্ত স্তরে উঠেছে।

উত্তর অ্যাটলাণ্টিকের রণাঙ্গনে

কিছুদিন থাকতে হবে লক্-এ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে। নিকটবর্ত্তী ধীবরপল্লীর ধীবরদের ধরা টাট্কা মাছ, ভাজা খাওয়া হচ্ছে প্রত্যহ-ই। আবার তো এ' জিনিষ সেই নিউইয়র্কে—ওপারে। সারা দিন যেন কাটে না। সকাল থেকে সুরু করে খাওয়া, গল্প এবং মধ্যে মধ্যে রেডিও খুলে পৃথিবীর নানা কেন্দ্র থেকে বীরত্বের আস্ফালন, বক্তৃতা, নানা কণ্ঠের গান শুন্‌তে শুন্‌তে বিরক্তি ধরে যায়।

যাত্রার আগের সময়টা মানুষের এমনি বটে। যে দেশ বা যাদের ছাড়্‌ছি অজান্‌তে সে দেশের এবং তাদের ছবিগুলো মনের ওপর অঙ্কিত হ'য়ে থাকে। বিদেশ হ'লেও ছেড়ে যেতে কেমন লাগে, তথাপি যাত্রার নামেই মনটি পড়ে থাকে গন্তব্যস্থানের দিকে।

তারপর একবার পথে বেরিয়ে পড়ে পেছনের পথটা যত দীর্ঘ হ'য়ে ওঠে নিকটতম স্মৃতিগুলি ক্রমেই আবছা হয়ে আসে, সম্মুখের আকর্ষণ হয় প্রবলতর। কোথাও তখন পথের মাঝে হঠাৎ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষায় শ্রান্তি আসে, বিরক্তি আনে।

লক-এ সাত আট দিন একভাবে কেটে গেল। কি করছে ওরা এতদিন ব'সে ব'সে। এতগুলো জাহাজ যে এতদিন ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে ওপারে যাবার জন্য, কর্ত্তৃপক্ষ কি ভুলেই গেল নাকি? সকল স্থানেই, অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কী বিরক্তিকর! মনে হয়, এর চেয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পথের সহস্র বিপদের সম্মুখীন হওয়া অনেক গুণ বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাসে চিরকাল এই অধৈর্য্যের জন্য বহুবার বহু জাতির রণাঙ্গনে পতন হয়েছে। প্রতি যুগে যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের মধ্যে ধৈর্য্যের প্রতিযোগিতায় জয়ী জাতি সহস্র প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে অবশেষে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অধৈর্য্য যে, পরবর্ত্তী বহুকালের জন্য তাকে পরাজয়ের গ্লানি, বহন করতে হয়েছে; নৈতিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বহু স্তর নীচে নেমে আসতে হ''য়ছে তাকে। যতদিন পর্য্যন্ত না নিজের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বা করতে পারা যাচ্ছে, শত্রুর অনুকূল অবস্থার মধ্যে গিয়ে কিছুতেই তার মুখোমুখী দাঁড়ালে চলবে না, তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। শত্রুর স্পর্দ্ধায় বিচলিত হওয়া দুর্ব্বলতা। তার হুঙ্কার উপেক্ষা করে এবং নিজ দলের অসহিষ্ণু যারা তাদের প্ররোচনায় দিশেহারা না হ'য়ে স্থির মস্তিষ্কে, ত্রিনেত্র উন্মুখ রেখে অপেক্ষা করতে হবে সেই মূহুর্ত্তটির জন্য, যখন আমার বল তার চেয়ে বহু অধিক। সেই মূহুর্ত্তে শত্রুর প্রতি দয়া কেবল দুর্ব্বলতা নয়, অপরাধজনক; নির্ম্মম, নিষ্করুণ আঘাতে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা শুধু নয়, প্রতিবাদের প্রবৃত্তিকেই শুদ্ধ করে দিয়ে, তারপর দ্বিতীয় কথা।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন নয়—আত্মরক্ষা। সমাজের, জাতির, শত্রু সমাকীর্ণ জগতের মধ্যে আত্মরক্ষা। জগৎ মূর্খের বীরত্বকে প্রশংসা করে না—আত্মপ্রতিষ্ঠ, সুদৃঢ়, নির্ম্মম জাতিকে ভয় করে, সম্মান করে। ভারতের তামসিক যুগ প্রারম্ভে নীতিশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, প্রাচীন আর্য্যদের বংশধরগণ ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখিয়ে বিপুল আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, আপনার অনুকূল অবস্থায় বিজাতীয় ম্লেচ্ছ ও যবন শত্রুদের মর্ম্মন্তুদ প্রহারে অভিভূত না ক'রে প্রচণ্ড আত্মগরিমা লাভ করতে পারেন এবং স্বেচ্ছায় তাকে বলবৃদ্ধি করবার সুযোগ দিয়ে অবশেষে শত্রুর অনুকূল অবস্থায় তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে ব্যক্তিগত বীরত্বের অহঙ্কারের

তৃপ্তি-সাধন করতে পারেন—কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষিত বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রে উপেক্ষা করে, তাঁরা পরবর্ত্তীকালের আর্য্য বংশধরদের কাছে অপরাধী হ'য়ে রয়েছেন।

সর্ব্বকালের জন্য সনাতন এই নীতিশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিগণ রাষ্ট্রনীতির, রণনীতির, অ হ'তে ং পর্য্যন্ত বিশদরূপে বর্ণনা করেছেন, আজ বিদেশী ও বিজাতির পক্ষপুটতলে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত এদেশের করুণ রসাত্মক রাজনীতির ধনুর্দ্ধরেরা সেই নীতিগুলিকেই অ-ভারতীয় ব'লে উল্লেখ করে থাকেন!

এই নীতি অনুযায়ী, বাচালতা এবং হঠকারীতা নয়, পরন্তু সংযম, কর্ম্মকুশলতা ও ধৈর্য্যই সকল কাজে সিদ্ধিলাভের উপায়। ধৈর্য্য, কর্ম্ম-তৎপরতা এবং শত্রুর দুর্ব্বল মূহুর্ত্তে তাকে প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর আঘাতে নিপাতিত করা, নীতিশাস্ত্রের এইসব নিয়ম পালন করাতেই আজ প্রাথমিক শত বিপত্তি সত্ত্বেও মিত্রশক্তি এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

নিজ দুর্ব্বল মূহুর্ত্তে এই নিয়ত অপেক্ষা, বিভিন্ন সমুদ্রে শত শত নাৎসী মৃত্যুদূতের উপস্থিতি সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের বহু জাহাজকে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে বিচরণ করতে সমর্থ করেছে। নতুবা মিত্রপক্ষের সকল জাহাজই নির্ম্মূল ক'রে আজ নাৎসীরা পৃথিবী ভোগ করত।

অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মত নাতিশাস্ত্রও শাশ্বত। এই নীতি-ই ইংরাজী ভাষায় গালভরা শব্দ 'ষ্ট্রাটেজী'। এর মূল কথা বোঝা খুবই সহজ —প্রয়োগ দুরূহ, চরিত্র সাপেক্ষ। নিয়ত অভ্যাসলব্ধ চরিত্র যাঁর আছে একমাত্র তিনিই নাতি বা ষ্ট্রাটেজা কার্য্যকরী করতে সমর্থ। কেবল 'মেকিয়াভেলি' প'ড়ে বা 'ক্লসুইজ' এবং 'ফস্' আবৃত্তি করে রাজনীতি বা রণ নীতির প্রয়োগ চলে না—অসাড় এবং হাস্যাস্পদ পাণ্ডিত্যাভিমান চলে

অবশেষে একদিন লক্ থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে প'ড়ে যখন বুঝলাম, অনেকগুলি সাবমেরিন এবং অন্য রণতরীও আমাদের এতবড় এই ঝাঁকটির প্রত্যাশায় ছিল এবং হয়তো এখনও আছে, তখনই এই সুদীর্ঘ অপেক্ষার কারণ বুঝলাম। দুখানা বড় ক্রুজার, আটখানা ডেষ্ট্রয়ার, অনেকগুলি করভেট সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এবার অ্যাটলান্টিক উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ সহজসাধ্য হবে না। বাইরের খোলা সমুদ্রে বোধ হয় অনেক দিন থেকেই শত্রু সাবমেরিন আমাদের জন্য বসে আছে। এ' পক্ষে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও ওদের ধৈর্য্যচ্যুতির কোন লক্ষণই দেখা গেল না, পালা ক'রে ওরা আমাদের বাত্রাপথের দিকে চেয়ে আছে শ্যেনের দৃষ্টি নিয়ে। লক্ থেকে বেরুতে হবেই একদিন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড এক কনভয় যে 'ইউ' ছাড়বে অ্যাটলান্টিকের পথে, সে খবর শত্রুপক্ষ ভালমতেই জানে। এত বড় সুযোগ তারা কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কেবল সাবমেরিন নয়, বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক আক্রমণ এই কনভয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত ক'রে একেবারে উৎসন্ন করবার চেষ্টাও হ'তে পারে। তাই যতদিন কনভয় রক্ষার জন্য যথেষ্ট শক্তি নৌ-কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করতে না পারছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে।

শীতকাল। নিবিড় কুয়াসার অন্তরালেই যেন নিরাপত্তা অধিক। কিন্তু নাৎসীরা ই-বোট নামে অদ্ভুত এক ক্ষুদ্র রণতরী নির্ম্মাণ করেছে। তার সাহায্যে কুয়াসার সুযোগ নিয়ে রক্ষী ডেষ্ট্রয়ারের চোখের সামনেই বাণিজ্য জাহাজগুলির একেবারে কাছে এসে টর্পিডো বা গোলার অভ্রান্ত আঘাতে বহু পোত ধ্বংস করেছে। এক একটি জাহাজকে আঘাত দিয়ে কুয়াশার অন্তরালে আত্মগোপন করে এই ই-বোট; রক্ষী জাহাজ গুলির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এড়াবার জন্য। পরে হয়তো কুয়াসা উন্মোচনী বোমার

সাহায্যে স্থানীয় কুয়াসা পরিষ্কার করে ডেষ্ট্রয়ার ই-বোটের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে নিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু এই অদ্ভুত জাহাজগুলির অস্ত্রসজ্জা এত উন্নত, যে অনায়াসেই ডেষ্ট্রয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে পারে।

জার্ম্মানীর রণতরী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর নির্দ্দেশ ছিল এই রণতরীগুলির নায়কদের ওপর, যেন কোন ক্রমে কোন ই-বোট শত্রুহস্তে নিপতিত না হয়, মিত্রপক্ষীয় রণতরী দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়্‌লে যেন সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন করে। ই-বোটের নির্ম্মাণ কৌশল ও অস্ত্র সজ্জা প্রণালী সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখা এই কঠোর আদেশের উদ্দেশ্য। যতদূর জানি, ১৯৪২এর জানুয়ারী পর্য্যন্তও কোন ই-বোট ধরা পড়ে নাই, যদিও মিত্রপক্ষ অন্ততঃ একটিও ধরবার জন্য চেষ্টা করছিল।

ক্ষুদ্র এই পোতগুলি ১৫০ ফিটের বেশী লম্বায় নয়, প্রস্থেও তদনুরূপ। একাধিক টর্পিডো টিউবের বন্দোবস্ত আছে, সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত শক্তিশালী নৌ-কামানও। এত ক্ষুদ্র জাহাজটিতে ক্ষিপ্রতা বজায় রেখে এই রণসজ্জা অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছিল, সমুদ্রবক্ষে ডেষ্ট্রয়ারে ও ই-বোটের যুদ্ধে কামান শক্তিতে এই নাৎসী বামন রণপোতটি পূর্ব্বোক্তের:সঙ্গে সমান তো বটেই; খরগতি ও টর্পিডো নিক্ষেপের অধিকতর সুবিধা থাকায় ডেষ্ট্রয়ার ই-বোটের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করে উঠ্‌তে পারে না। একমাত্র বৃহদাকার কামানের বহুদূরগামী গোলাই একে সায়েস্তা করতে পারে। কিন্তু ডেষ্ট্রয়ারের রণসজ্জায় বৃহদাকার কামান বসাতে গেলে এর ডেষ্ট্রয়ারত্ব থাকেনা—অর্থাৎ ক্রুজারের তুলনায় এর দ্রুত গমন শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, বড় কামান বসাতে গেলে অপেক্ষাকৃত ছোট কামান বসাবার জায়গা থাকে না, নিকটতর লক্ষ্যে বড় কামান চালানো যায় না।

শুধু তাই নয়, দু'-চারখানা ই-বোট একত্র হ'য়ে এবং কখন কখন একক, ভারী ক্রুজারকে ঘায়েল করেছে এ' দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ই-বোটের সৃষ্টি নাৎসীদের বৃহদাকার যুদ্ধজাহাজের অভাব ক্ষুদ্রতর এরূপ বহু জাহাজ দিয়ে কতকটা পূরণ করা এবং বাণিজ্য জাহাজ নষ্ট করা। উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল প্রভৃতি অঞ্চলেই এগুলোর ব্যবহার সমধিক।

অপেক্ষমান অনুসরণকারী সাবমেরিন ও অনুসন্ধানী নাৎসী বিমানের দৃষ্টি এড়াবার জন্য সন্ধ্যার পর রাত্রির অন্ধকারে প্রায় শতাধিক জাহাজের আমাদের কনভয় সারারাত্রি ধরে বহুবার গতি ও গতিমুখ পরিবর্ত্তিত করে অ্যাটলান্টিক বক্ষে চলতে লাগলো। পৃথিবীতে যে একটা যুদ্ধ চল্‌ছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অন্য কোন গ্রহের কোন কল্পিত নাবিক রাত্রির এক সময়ে কনভয়টিকে দেখলে ভাবতো, জাহাজগুলি বুঝি উত্তর মেরুর বরফ প্রদেশে বহু ঔপনিবেশিক নিয়ে চলেছে। অন্য সময়ে তার মনে হ'ত জাহাজগুলি বুঝি ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছে। আরো পরে জাহাজগুলি তার চোখে পড়্‌লে আমাদের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত, একই জায়গার মধ্যে চক্রাকারে ঘুরছি দেখে, জাহাজগুলি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে ভেবে। আর সারারাত্রি ধ'রে সমগ্র ব্যাপারটি পর্য্যবেক্ষণ করলে কল্পিত এই নাবিক নিঃসন্দেহে অনুমান করতো অ্যাটলান্টিক বক্ষে সহসা কি একটা হয়েছে, অকস্মাৎ শতাধিক জাহাজের নাবিকগুলি উন্মত্ত হয়ে পড়েছে, গন্তব্য লক্ষ্য ভুলে গিয়ে সমুদ্রের ওপর খেলা করছে।

সকালে উঠে দেখা গেল, গভীর সমুদ্রে মোটামুটি অতি অল্পই অগ্রসর হ'তে পেরেছি। সারাদিন ধরে কনভয়ের নায়কের রণপোতটির ওপর বিভিন্ন সঙ্কেত পতাকা উঠ্‌ছে কনভয়ের জাহাজগুলিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দ্দেশ দিয়ে। সকল জাহাজ এই পতাকাগুলি দূরত্বের জন্য পড়্‌তে পারে না, অল্প-বিস্তর কুয়াসাও দৃষ্টিশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে

দেয়। কনভয়ের একশত জাহাজ দশটি পৃথক সারিতে সাজান। সারিগুলির মুখে যারা থাকে তাদের বলা হয় নেতৃজাহাজ। সম্মুখের নির্দ্দেশদানকারী রণপোতটি থেকে সারিগুলির পেছনের দিকের জাহাজ-গুলির দূরত্ব অনেক সময় পাঁচ ছয় মাইলও হ'য়ে পড়ে। তাই রণপোতটিতে কোন সাঙ্কেতিক পতাকা উত্তোলিত হ'লে এই নেতৃজাহাজগুলি আবার সেই সঙ্কেত আপন আপন বক্ষে তুলে ধরে। পরবর্ত্তীরাও ক্রমে সেরূপ করে। এই প্রক্রিয়ায় কনভয়ের মধ্যে সকল জাহাজই নির্দ্দেশটি জানতে পায়। আন্তর্জ্জাতিক নৌ-রীতিতে যে বর্ণসমষ্টির পতাকায় যে অক্ষর, এখানেও তা-ই ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দ সাঙ্কেতিক কথা। যাত্রার প্রাক্কালে শীলমোহর করা খামের মধ্যে কনভয়ে ব্যবহৃত হবে এমন সব সাঙ্কেতিক শব্দ ও তার অর্থ আমাদের দেওয়া হয়। বন্দর বা লক্ ছেড়ে গভীর সমুদ্রে আসবার পর এই শীলমোহর ভাঙ্গার নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে। অর্থ সুপরিষ্কার। কোনভাবে বাইরের কোনও ব্যক্তির এই সঙ্কেতগুলির অর্থ জানবার উপায় না থাকে।

স্বভাবতঃই সতর্কতা সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়। আর এ যুদ্ধে তো ইংল্যাণ্ডে বিভীষণের (কুইস্‌লিং না ব'লে বিভীষণই বললাম !) অভাব ছিল না। একটা জিনিষ, মিত্রপক্ষের দুর্দ্দিনের সময়, বৃটেনের বন্দরগুলি থেকে বহির্গামী সকল জাহাজই প্রায় লক্ষ্য করেছে, বন্দর থেকে জাহাজ সমুদ্রে বেরুলেই অভাবনীয়রূপে শত্রুবিমান আকাশ পথে আসতে দেখা যেত। অথচ তার আগে কোন অনুসন্ধানী শত্রু বিমান বন্দরের ওপর দেখা যায় নাই। লকে থাকতে আমরা কোনদিনই কোন শত্রু বিমান দেখি নাই। তাই অনেকেই অনুমান করতেন—এ অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়—ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের ভেতর বিশেষ কতকগুলি জায়গা থেকে, যে উপায়েই হোক্, নাৎসীরা জাহাজ চলাচলের অনেক তথ্যই নিয়মিত ভাবে

পাচ্ছিল। একমাত্র যাঁরা বিভাগীয় উচ্চ পদগুলিতে থাকেন তাঁরাই এসব গোপনীয় সংবাদ রাখেন এবং অপরকে দিতে পারেন, এ সংসর্গে এই তথ্যটিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

যুদ্ধ সুরু হ'বার অব্যবহিত পরেই বৃটেনে বহু নরনারীকে যে অন্তরীণ ক'রে রাখা হয়েছিলো সে কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। স্বজাতি কুৎসা রটনাকারী একশ্রেণীর লোক এদেশে এই আটত্রিশ কোটি মানুষের মধ্য থেকে বিভীষণ বেরুলেই সেই উপলক্ষ্যে সারা দেশটিকেই ধিক্কার দিতে সুরু করে। ভারতীয় চরিত্রের জঘন্যতা নিয়ে তারস্বরে কপট বিলাপ সুরু ক'রে এই ঘৃণিত লোকগুলি সমস্ত জাতিকে অবসাদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করে। জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে এই কুৎসা রটনাকারীরা সকলেই ভারতবর্ষের শত্রুতাই কর্‌ছে।

তাই বিদেশী ও স্বদেশী অপবাদে আত্মবিভ্রান্ত জাতির আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করবার জন্য তাকে জানান প্রয়োজন, 'বিভীষণ' সকল দেশে, সকল কালেই জন্মগ্রহণ করে এবং পরাধীন দেশে এই বিভীষণদেরই অনেকে আত্মবিলাপ করে জাতির উত্থান প্রবৃত্তি নষ্ট করতে চেষ্টা করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকবৎসর যখন মিত্রশক্তি জার্ম্মানীর অনেক অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে শাসন করছিল, একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী বলেছিলেন, জার্ম্মানীর প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তি হয় বদমাইস নয়তো দেশদ্রোহী গুপ্তচর। হিটলারের মেইন ক্যাম্ফে এতটা না হ'লেও জার্ম্মানীর ভেতর যে বহু লোক অর্থ বা মিথ্যা মোহে ফরাসীদের কাছে নিজ দেশের এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করত সে খবর পাওয়া যায়। অথচ ভারতবর্ষের মত এত শতাব্দী ধরে জার্ম্মানীকে বিজাতিয় শাসনের পদচিহ্ন বুকে ধরতে হয় নাই। জার্ম্মানীর অন্তর্জীবনে

মাত্র কয়েকটি বৎসর বিদেশীর হস্তক্ষেপে অবস্থা যদি এতদূর সঙ্গীন হয় যে লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশকেই বিশ্বাসঘাতক বা দুষ্ট ব'লে কেউ অভিহিত করতে পারে, ভারত সম্বন্ধে কি বলার থাকে ? ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি ! বহু শতাব্দী ব্যাপি সহস্র বৈদেশিক ষড়যন্ত্রেও তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও পরিপূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। অন্য যে কোন দেশ বা জাতি এ অবস্থায় এতদিন থাকলে, তা'র বিশিষ্ট অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না।

অথচ ১৯২৩ সালে যে জার্ম্মানদের এক তৃতীয়াংশই দেশদ্রোহীর পর্য্যায়ে গিয়ে পড়েছিলো, ১৯৩৩ সালে সেই জাতিই আবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। তখনকার একটি মানুষকেও তখন মিত্রশক্তির গুপ্তচর বিভাগে কার্য্যকরীভাবে পাওয়াই হয়তো মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেই জার্ম্মাণদেরই অত্যুগ্র দেশপ্রেমে ও জাতিপ্রেমে অন্য দেশ এবং জাতির অস্তিত্ব রাখা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ল !

সেই মানুষ, সেই দেশ—মোটে দশ বৎসরের মধ্যে একি পরিবর্ত্তন ! কোথায় গেল সেই সব বিভীষণ, যাদের জন্য সে দেশের জাতীয় জীবনে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল। জার্ম্মানীর নৈতিক অবনতি দেখে নিতান্ত দুঃখেই যে ইংরাজ কর্ণেলটি জার্ম্মাণদের সম্বন্ধে এতবড় একটা মন্তব্য করেছিলেন, জানি না দশ বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন কিনা এবং নতুন করে আবার এদের সম্বন্ধে কি ভাবছিলেন !

তারপর ধরা যাক রুশদের কথা। জার্ম্মাণ-রুশ যুদ্ধ যখন সুরু হ'ল মিত্রপক্ষের রণপণ্ডিতরাও ভেবেছিলেন মাস তিনেকের মধ্যেই রুশিয়ার কার্য্যকরী প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এদের কষ্টি পাথর ছিল ১৯১৪-১৭ সালের এবং তৎপূর্ব্বের রুশ। ইতিপূর্ব্বে কোন যুদ্ধেই রুশিয়া কোনদিনই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারে নাই।

বিশালবপু এবং সুপ্রচুর লোক সংখ্যা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধশালী দেশগুলির কাছে প্রায়ই পরাজিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে এই রুশকে মিত্রশক্তি বাষ্পীয় রোলার হিসাবেই ব্যবহার করেছিল। যে কোন যুদ্ধে যেমন ভারতবর্ষের জনবল ও ধনবল শোষিত হয়, 'স্বাধীন' রুশিয়ার অপদার্থ জারতন্ত্রে রুশিয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিতান্ত অসাড় ও লোভপরতন্ত্র আভিজাত্য প্রাধান্যে রুশিয়ার অবস্থাও ঠিক তেমনই ছিল।

অথচ সেই দেশ, সেই জাতি, নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রকে বিকল করে দিল। পূর্ব্বতন রুশ এখনও পৃথিবীবক্ষে অধিষ্ঠিত থাকলে এতদিনে নিঃসন্দেহে জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বস্তিকা চিহ্নিত পতাকা উড়তো। কথাগুলি জাতিবিশেষের এবং এদেশের ব্যক্তি বিশেষদের কাছে বড়ই শ্রুতিকটু, কিন্তু অবিসম্বাদী সত্য। নাৎসীরা য়ুরোপের সকল দেশেই পঞ্চম বাহিনী পেয়েছিলো, কিন্তু এখানে পায় নাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের জনসাধারণের আচরণ ও কর্ম্মদক্ষতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নেতৃত্ব ও সুনিপুন নেতৃত্ব প্রসূত সঙ্ঘ এবং বিধিব্যবস্থার ওপর। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা যখন উপযুক্ত নেতৃত্ব পরিচালিত হয়, তখন বিভীষণের দল নিতান্ত নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। পররাষ্ট্রের সঙ্গে জীবনমরণ যুদ্ধের সময় এই সব বিষধর আবার মাথা তুলে ধরে, তাই এদের তখন কারাগারে রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন দেশে বিদেশী রাষ্ট্রভার এসে পড়লে এরাই হয় তখন সমাজে প্রধান। কারণ, বিদেশীর স্বার্থ নব অর্জ্জিত দেশের জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক অবনতি যতদূর সম্ভব বিস্তৃতি করা। সাধারণ মানুষ 'উপরে' যা বা যাকে দেখে তাই এবং তাকেই অনুকরণ করে। দেশের হীন চরিত্রের ব্যক্তিদের 'উপরে' তুলে ধরে বিদেশী শাসক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। ছদ্মবেশী এই বিভীষণ দলের

একটা অংশ নিয়ত নানাভাবে 'বিদেশী' মহিমা কীর্ত্তন করে দেশের মধ্যে 'দাসভাব' এনে শৃঙ্খল চিরস্থায়ী রাখতে প্রচেষ্ট হয়।

ইংল্যাণ্ডের যে সব বিভীষণ যুদ্ধের সময় বেড়াজালে পড়ে নাই তাদের নামও জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর সোভিয়েট ও আমেরিকান কর্ত্তৃপক্ষ পেয়েছিলো। রাষ্ট্রযন্ত্রের ও সমাজের উচ্চ স্থানে ব'সে এই 'বড়রা' ছোটদের মৃত্যুপথে পাঠাচ্ছিল পূর্ব্বাহ্নেই শত্রুকে এদের গতিবিধির বহু সংবাদ দিয়ে। পাছে এই লোকগুলির নাম প্রকাশে 'বড়'র ওপর 'ছোট'র ভক্তির অভাব ঘটে, তাই সেগুলি প্রকাশ করা হবে না বলে ঠিক হয়েছে!

ইংরাজ নরনারীর সৌভাগ্য, এ শ্রেণীর লোক বেশীদিন যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রযন্ত্রে আধিপত্য করতে পারে নাই, নতুবা এতদিনে ইংরাজ শিশু ইংরাজ ঐতিহাসিকদের লিখিত স্কুল পাঠ্য পুস্তকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বর্ব্বর যুগের পাঠ নিত!

সকল দেশে ও সকল কালে একটা পুরো সমাজ বা দেশ অমর বিভীষণ শূন্য থাকে না ব'লেই দেশরক্ষা কাজে গোপনীয়তা এত প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের এবং জাতির উত্থান পতন সমস্যা, তাই সাঙ্কেতিক ভাষা বিশেষ করে এ সময় চিররীতি।

সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে বিশাল এই 'কনভয়' সারা দিন বিচিত্র গতিতে চলে সন্ধ্যার একটু আগে নির্দ্দেশ পেলো, অন্ধকারের পর রাত ৮টা থেকে মধ্যরাত্রির ১২টা পর্য্যন্ত জাহাজগুলি নতুন গতিতে আর একটি নতুন দিকে যাবে। রাত ১২টার পর থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত পুনরায় গতিমুখ ও গতি বদ্‌লে যাবে এবং তারপর সকাল ৮টায় মিলন-ক্ষেত্র কোথায় হবে সে নির্দ্দেশও পাওয়া গেল। রাত্রিতে আলোকের সাহায্যে দ্বিতীয় কোন উপদেশ দেওয়া চলবে না—তার অর্থ মেষপালের ওপর ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রকে নিমন্ত্রণ করে আনা।

রাত দশটায় নিজ কর্ত্তব্যশেষে ক্যাবিনে প্রবেশ করে বাইরের সমুদ্রের পরিবেষ্টন থেকে কিছু সময়ের জন্য স্থলের আবহাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হ'তে ইচ্ছা হ'ল। ক্যাবিনের দরজা জানালাগুলো বেশ ভাল করেই আঁটা যায় কিনা, ভেতরের সামান্য আলো ক্ষীণতম রশ্মিরূপে বাইরে যেতে পারে কিনা রুদ্ধ এগুলোর কোন ফাঁকের মধ্য দিয়ে, বন্দরে থাকতেই বিশেষ করে পরীক্ষিত হয়েছিলো। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের রেডিওটির স্যুইচ্ মুচরে একে উন্মুখ করে দিলাম. বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের উৎক্ষিপ্ত বেতার তরঙ্গগুলিকে সমাদরে গ্রহণ করতে।

সময়টা আমাদের স্থানীয়—অর্থাৎ যত ডিগ্রি পশ্চিমে যাচ্ছি আমাদের ঘড়ির কাঁটাও ইংল্যাণ্ডের সাধারণ সময় থেকে প্রতি ডিগ্রিতে চার মিনিট হিসেবে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাহাজ যখন সমুদ্রে চলে তখন এই স্থানীয় সময়ও তাই প্রত্যহই পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রীন্উইচের সময়ও রাখা হয় চার্ট রুমে, ক্রনোমিটার ঘড়িতে। পৃথিবীর সকল দেশের বেতার কেন্দ্রগুলো থেকে সমুদ্রের জাহাজগুলিকে সাহায্য করবার জন্য প্রত্যহই অনেকবার গ্রীনউইচের সময় জানান হয়—একে বলা হয় টাইম সিগন্যাল। টাইম সিগন্যাল সাহায্যে সকল জাহাজের ক্রনোমিটার ঘড়ির সময় সূক্ষ্মভাবে মেলান হয়। আধুনিক নৌ-বিদ্যায় নাবিকের কাছে ক্রনোমিটার অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র।

পৃথিবীর যে কোনও স্থানে সেক্সটাণ্ট যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যাহ্ন নিরূপণ করে, ক্রনোমিটারে তখন গ্রীনউইচের যে সময়টি পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে বিয়োগ করে, যত ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড তফাৎ হয় তা-ই থেকে স্থানীয় দ্রাঘিমা রেখা ধরা পড়ে। অক্ষাংশ নির্ণীত হয় একই যন্ত্র দিয়ে সূর্য্যের মধ্যাহ্ন উন্নতি অর্থাৎ দিগন্তের সঙ্গে সূর্য্যের যতখানি কোন রচনা হচ্ছে নৌ-সারনীর কথা হিসেবে সেই কোন্ তখন কত অক্ষাংশে রয়েছে তাই দেখে।

বি, বি, সি থেকে ওদের প্রোগ্রাম শুন্‌ছি—গান, বাজনা, ঠাট্টা, রহস্য শেষ হ'য়ে গেছে। এক বক্তা, বাংলায় যাকে বলে ওজস্বিনী ভাষা, সেই ধরণের ভাষাতে বর্ণনা সুরু করলেন অ্যাটলান্টিক যুদ্ধের কথা। অ্যাটলান্টিক সমুদ্র ইংল্যাণ্ডের কাছে যে কি জিনিষ তিনি বোঝাচ্ছেন। বল্‌ছেন, এই অ্যাটলান্টিকের বুক বেয়ে ইংরাজের কীর্ত্তি দিকে দিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই অ্যাটলান্টিকের বারিধি সযত্নে লক্ষ লক্ষ ঔপনিবেশিক নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজের এক নতুন বসতি স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। সুদূর অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান ইংরাজ সভ্যতার নব নব কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে অ্যাটলান্টিকের কল্যানেই। এই অ্যাটলান্টিক দিয়ে তিন চার শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান বৃটিশ জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ ওপারে ঐ আমেরিকাকে শ্বেতাঙ্গের নব, বিচিত্র, লীলাক্ষেত্র করেছিলেন, এখনও আছে অ্যাটল্যান্টিকের অপর পারে সেই দেশ, আজ ধনে, সম্পদে, ঐশ্বর্য্যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। ইংরাজের নিতান্ত নিকটতম আত্মীয়,—মামাত, পিসতুত, মাসতুত ভাই ভগ্নী সব। এই অ্যাটলান্টিকের গভীর জলরাশি আছে ব'লেই তাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্বন্ধ রাখা চল্‌ছে। অ্যাটলান্টিক বৃটেনের প্রাণ, গাল্‌ফ্‌ ষ্ট্রীমের উষ্ণতা ব'য়ে এনে ইংল্যাণ্ডকে নিদারুন তুষার-শীতলতা থেকে রক্ষা করছে। আজ ইংল্যাণ্ডের সহস্র সহস্র নাবিক বৃটেনের প্রাণের প্রাণ এই অ্যাটলান্টিক পথ খোলা রাখছে ভীষণ অবস্থার মধ্যে।

তারপর তিনি ডাকলেন একজন নাবিককে। শ্রোতাদের বল্‌লেন, ইংল্যাণ্ডের প্রাণ পথ যাঁরা আত্মদান করে উন্মুক্ত রাখছেন, দেশের গর্ব্ব সেই নাবিকদেরই একজন এখন আপনাদের বলবেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। উত্তর অ্যাটলান্টিকে শত্রু সাবমেরিন আক্রমণে কেমন করে তাঁদের জাহাজ ধ্বংশ হয়, কেমন করে তিনি জীবনতরীতে প্রায় ১৮।২০

দিন অনাহারে অনিদ্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কাটিয়েছিলেন এবং নিতান্ত ভাগ্যবশে একটি ইংরাজ রণতরী দ্বারা দৃষ্ট হ'য়ে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, সে সব কথা। নাবিক বক্তা থেমে থেমে সব কথা বলা শেষ করে, তার পর বললেন, শুধু তিনি নন্, ইংল্যাণ্ডের নাবিককুলের সকলেই এ' বিপদে বারে বারে জাহাজ হারিয়েও যদি বেঁচে দেশে আস্‌তে পারে তো আবার সানন্দে সমুদ্রে যাবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রয়েছে।···

রেডিও বন্ধ করে আলো নিবিয়ে একবার বাইরে এসে ঘুমুতে যাবার পূর্ব্বে জাহাজের স্থিতি এখন সমুদ্রের কোথায়, চার্ট রুমে গিয়ে দেখে নিলাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখনও ভাবছি বি, বি, সি'র কথাগুলি; ওদেশের সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়ে থাক্‌লে কার কাছে বলছে কথাগুলি? অন্ততঃ একটুও অ-সাধারণ যা তা-ই তো বিশেষ করে উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে 'সাধারণের' কাছে। পরে বন্দী অবস্থায় যখন বহু ইংরাজ নাবিকের নিবিড় সংস্পর্শে আসি তখন এই 'সানন্দে সমুদ্র যাত্রার' নিছক গল্পটিরও সমস্ত তথ্যই জান্‌তে পারি।

গভীর রাতে নিদ্রার গভীরতায় আচ্ছন্ন—জাহাজের এলার্মে ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুয়ে শুয়েই অনুভব করবার চেষ্টা করলাম জাহাজখানা ঠিক আছে কিনা! বিছানা থেকে উঠে জামা কাপড় যথোপযুক্ত ভাবে বিন্যাস করে লাইফ্ জ্যাকেটটা নিয়ে ঘর থেকে বেরুব, তৃতীয় রেডিও অফিসার কানাডিয়ানটি সাম্‌নে।

কনভয় আক্রান্ত হয়েছে! লোকটি হাঁপাচ্ছিল।

ওপরে এসে ব্রীজে দেখি কাপ্তেন এসে গেছেন। সে সময় ব্রীজের ওপর ডিউটি ছিল চিফ্ নেভিগেটিং অফিসারের। তিনিও আছেন, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চিফ অফিসার বললেন, 'ভেরী' লাইট আকাশে উঠেছিল। কনভয়ে

আমাদের অপর প্রান্তে সাবমেরিন আক্রমণ হয়েছে, সেদিককার একটি জাহাজে টর্পিডোর বিস্ফোরণও হয়েছে। জাহাজটির কি হ'ল জানবার উপায় নাই।

কিছুক্ষণ পরে, কিছু দূরে ক্ষুদ্র একটি আলোক পিণ্ড আকাশের গায়ে ফেটে পড়ে খানিকটা সময় জ্বলে, আস্তে আস্তে নিভে গেল। শ্মশান চিতার মত সমুদ্র বক্ষে একটা জায়গায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। এবার নিশ্চয় তেলের জাহাজ। সেখানে আশে পাশের সমুদ্রের ওপর আগুন ধরে গেল। ক্ষিপ্ত অ্যাটলান্টিকের বারিধি যেন তারই বুকের ওপর স্বভাব শত্রুর এ' স্পর্দ্ধা সহ্য করতে পারছিল না, তরঙ্গের পর তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে আবার অন্ধকার টেনে আনলো। দারুণ বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, পর্ব্বত প্রমাণ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসগুলি, কে জানে কি কর্চ্ছে হতভাগ্য ঐ দ্বিতীয় জাহাজটির লোকগুলি। হয়তো, অনেকেই কাল আর দিনের আলো দেখবে না।

একখানা ডেষ্ট্রয়ার আমাদের বাঁ দিক দিয়ে এসে ব'লে গেল লাউড স্পীকার দিয়ে, কোন জাহাজই যেন স্থান পরিবর্ত্তন না করে। ছত্রভঙ্গ হওয়াও বিপজ্জনক। এই কুয়াসায় সকলে যদি নানা দিকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করে, পরস্পরের মধ্যে শারীরিক সংঘর্ষ হ'য়ে ভীষণতর অবস্থার সৃষ্টি হবে। দু'খানা করভেট একটু পরেই দেখা গেল, কনভয়ের ভেতর প্রবেশ করলো—আরো কিছু সম্ভবত অন্য দিক দিয়ে ঢুকেছে। এক একটি মিনিট যেন এক একটি যুগ—অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে কেবল সমুদ্র কল্লোল, আর দেখা যাচ্ছে ফেটে পড়া ঢেউগুলির শ্বেতফেন রচিত সহস্র সহস্র শ্বেত-পদ্ম। চেয়ে আছি, আবার কোথায় 'ভেরী লাইট' ওঠে। আমাদের 'ভেরী' লাইটগুলিও হাতের কাছেই রয়েছে।

মিনিট পনের চলে গেল। নিকটেই জলবোমা ফাটছে, এক, দুই

তিন, চার পাঁচ ছয় সাত·····গুনছি। একশ' পর্য্যন্ত গুনেছিলাম, তার পরেও অনেকানেক জলবোমা বিস্ফোরণের শব্দ পেলাম।

করভেটগুলো সাবমেরিনগুলোর ওপর প্রতিআক্রমণ চালাচ্ছে। দর্শক অ্যাটলান্টিক নিরপেক্ষ, ভ্রূক্ষেপও করছে না অহঙ্কারী মানুষের হাস্যাস্পদ ক্ষীণ শক্তির স্পর্দ্ধা। জলবোমাগুলো সমুদ্রবক্ষের কিছু নীচে গিয়ে বিস্ফুরিত হচ্ছে, এক একটি বোমাকে কেন্দ্র করে প্রতি বিস্ফোরণ সেখান থেকে বিশিষ্ট একটি ব্যাসার্দ্ধগঠিত বৃত্ত মধ্যগত জলরাশিকে তোলপাড় করে দানবীয় চাপের সৃষ্টি করছে। একটি বোমার বিস্ফোরণ ফলে সমুদ্রের জলমধ্যে যতদূর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী চাপ তৈরী হয়, ঠিক ততদূর অন্তর অন্তর একসঙ্গে বহু বোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সন্দেহজনক স্থানের চতুর্দ্দিকে।

এ' বোমা সাবমেরিনের একেবারে গায়ে ফেলবার কোন প্রয়োজন নাই—সম্ভবও নয়। সাবমেরিনের চারিদিকে পড়ে বোমাগুলি যে সহস্র সহস্র টনের এক অভাবনীয় এবং আকস্মিক চাপ জলমধ্যে সৃষ্টি করে, তাতে জলমধ্যে বৃহৎ দেহবিশিষ্ট কোন কিছুরই থাকবার উপায় নাই। এই চাপে সাবমেরিনের পরস্পর সংযুক্ত গায়ের ইস্পাতের পাতগুলি খুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এই জলদৈত্যটির দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের শিরা-উপশিরাগুলি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে পড়ে। জলের নীচে সাবমেরিনের জীবন বৈদ্যুতিক শক্তি। বৈদ্যুতিক বন্দোবস্ত অচল হ'য়ে পড়লে তার মৃত্যু। অনেক সময় ডেপ্‌থ্‌চার্জ্জ অর্থাৎ জলবোমা আক্রমণের পর সমুদ্রপৃষ্ঠে তিমি ও বড় বড় জন্তুকে মৃতাবস্থায় ভাসতে দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধে বেচারা জলজন্তুরও পরিত্রাণ নাই!

কি হ'ল কিছুই বোঝা গেল না। কনভয়ের প্রত্যেকটি জাহাজের মানুষগুলো ভাবছে এই বুঝি অন্ধকারের বুক চিরে আর এক প্রবল বিস্ফোরণ হয়, টর্পিডো আক্রমণ এবার বুঝি তাদের ওপরই হ'ল।

সারারাত আশঙ্কা ও অপেক্ষার মধ্যে কাটল—নতুন আর কোন অবস্থার সৃষ্টি হ'ল না। কলের মত সকলেই আপন আপন স্থানে কাজ করছে। অঘটন যদি ঘটেই যায়, চব্বিশ ঘণ্টা ভাসিয়ে রাখবার জন্য কার্পাস তুলোর লাইফ জ্যাকেট সকলের গায়েই রয়েছে। অসুবিধা কিছু নাই, শীতে আরামপ্রদও যথেষ্ট।

প্রভাতের কুয়াশা কথঞ্চিৎ কাটলে শুনছি—কে আছে, কে নেই। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার আগে রক্ষী জাহাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনের সময় আমাদের জায়গায় যে বৃটিশ জাহাজটি গিয়েছিলো সেটিকে পাওয়া গেল না! রাত্রের দ্বিতীয় 'ভেরী লাইট' তারাই ছুঁড়েছিল। তা'ছাড়া আরো ছয়টি অদৃশ্য হয়েছে। 'ভেরী' লাইট দেখেছিলাম দু'বার—কনভয়কে সতর্ক করবার জন্য নিমজ্জমান জাহাজ থেকে উৎক্ষিপ্ত বিপদ-সঙ্কেত। আরগুলি হয় কুয়াশায় দেখি নাই অথবা রাত্রির অন্ধকারে যূথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছে। দু'খানা ডেষ্ট্রয়ারও নেই, ক্রুজার দু'খানাও। কাল রাতের আক্রমণে সমুদ্রে পতিত নাবিকদের মধ্যে যারা এখন জলের ওপর জীবিত অবস্থায় ভাস্‌ছে বোধ করি তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে—অথবা, আর কিছু।

দুপুরে, বেলা প্রায় ১টার সময় নির্দ্দেশ এলো জাহাজগুলোকে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হ'য়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে ভেসে থাক্‌তে। চারখানা ডেষ্ট্রয়ার এবং সেই সংখ্যক করভেট কনভয়ের সম্মুখভাগ থেকে বামদিকে প্রায় ৩০° ডিগ্রির এক কোন্ রচনা করে সেই বাহু ধরে অনেকটা এগিয়ে গেল। আরও দূরে একটি করভেট কি যেন সঙ্কেত করছিল। প্রায় একঘণ্টাকাল এভাবে অপেক্ষার পর কনভয়টিকে পূর্ব্ব গতিমুখের দক্ষিণদিকে একটু হেলে প'ড়ে এগোতে' বলা হ'ল। সঙ্গে এবার কেবল একটি ডেষ্ট্রয়ার যাচ্ছে। আর কোন রক্ষী রণতরী এ'লো না। খুব

আস্তে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচমাইল হিসেবে ঘণ্টা দেড় এগিয়েছি, পেছনে বাম-দিকে জলবোমার বিস্ফোরণ শোনা যেতে লাগল। দেখি, সেদিকে দু'টো বিভিন্ন স্থানে করভেটগুলো চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বহু বোমা সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করছে। ডেষ্ট্রয়ারগুলো দূরে রয়েছে। প্রায় বিশ মিনিট এ'কাজ চললো। কিছু পরে কামান গর্জ্জন শুনছি—অদ্ভুত এক সামুদ্রিক জানোয়ার করভেটগুলো রচিত বৃত্তের মধ্যে ভেসে উঠেছে! জলবোমার ফল হয়েছে। সাবমেরিনের নাবিকেরা বোধ হয় আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু না,—মথিত জলদৈত্যটির কোনিং টাউয়ার থেকে গোলা বর্ষণ করছে ওরা। জলের নীচে আর থাকতে না পেরে ভেসে উঠেছে, পলায়ন অসম্ভব। এরাই বোধ হয় শতকরা শতভাগ নাৎসী। বন্দী হবে না, শেষ অস্ত্র একটি কামান এখনও আছে, শত্রুর যতদূর সম্ভব ক্ষতি করে রণাঙ্গনেই প্রাণ দেবে। এক সঙ্গে অনেক কামান গর্জ্জে উঠল ডেষ্ট্রয়ারগুলো থেকে। অ্যাটলান্টিক মানব-নির্ম্মিত ইস্পাতের এই বিচিত্র জলজন্তুটি গ্রাস করল।

আবার চলেছে কনভয় এখনও বহুদূরবর্ত্তী গন্তব্য লক্ষ্যের দিকে, বিচিত্র গতিতে। মানুষের জীবনধারা কনভয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। জীবনে বিশেষ লক্ষ্য আছে যাদের—শত সহস্র বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ত চেষ্টা করে তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে। এমনই করে কোথাও তাদের কাউকে এড়িয়ে চলতে হবে, কোথাও অপেক্ষা করতে হবে অতি সাবধানে কিছুকালের জন্য, এবং সুযোগ বুঝে বাধা কোথাও চূর্ণ করে চলতে হবে। সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে, সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্যতা আসে এই কনভয়ের আচরণের মত। সারা প্রকৃতির এই বিধান। কোন লক্ষ্যে যাবার জন্য বাধাহীন সোজা একটানা পথ নাই। কখন এগোতে হবে, কখন পিছিয়ে পড়তে হবে, কখন পাশ কাটিয়ে যেতে

হবে, স্থানবিশেষে প্রচণ্ড আঘাত পেতে হবে এবং অনুকূল অবস্থায় প্রচণ্ডতর নির্ম্মম আঘাত দিতেও হবে। কিন্তু সম্মুখেই যাই বা পিছিয়েই পড়ি, দক্ষিণেই স'রি কি বামেই পাশ কাটাই, সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে এই কনভয়ের জাহাজগুলোর মত অনির্দ্দিষ্টকাল সমুদ্রে থাকা যাবে না, লক্ষ্যে পৌছুতে হবে কয়লা, তেল, জল, খাদ্য নিঃশেষ হবার আগে—জীবন-বর্ত্তিকার তেলটুকু থাক্‌তে থাক্‌তে।

আলো, অন্ধকারের গতি নির্ম্মম—পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়ের অপেক্ষা রাখে না। ভীতিজনক তমসা আবার অর্দ্ধপৃথিবী আচ্ছন্ন করছে। রাত্রির অন্ধকার আক্রমণকারীদের বাঞ্ছনীয়, দিনের আলো আমাদের। পালা ক'রে রাত-দিন আস্‌ছে, পালা করে আমরাও আঘাত পাচ্ছি দিচ্ছি। অন্যায় কার, নাৎসীদের না মিত্রপক্ষের—সৌরজগতের নিয়ম ভ্রূক্ষেপও কর্‌ছে না। দিনের আলোর ব্যাপ্তিকাল আরও কিছু সময় প্রসারিত করে, মিত্রপক্ষের আমাদের সাহায্যও কর্‌ছে না, রাত্রির অন্ধকার সঙ্কুচিত করে হিটলারের সাগরতলের দৈত্যদের বিরুদ্ধতা করার কথাও ভাব্‌ছে না।

কনভয়ের গতিমুখ অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ডাইনে। গতিও এখন পরিবর্দ্ধিত। রাত্রি বারটার সময় গতিমুখ এবং গতি পুনরায় অন্যরূপ হবে। শত্রুর বুদ্ধিবৃত্তি ও উদ্যোগ উভয়ই অসাধারণ, তাই এত সাবধানতা।

মাটি থেকে বেরিয়ে মাটি না ধরা পর্য্যন্ত চলবে কনভয়ের এই বিরামহীন, ক্লান্তিহীন ও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন, সর্পগতি। অনন্ত সত্ত্বা থেকে উদ্ভূত হ'য়ে আবার সেই অনন্ত সত্ত্বাতে না ফেরা পর্য্যন্ত মানুষেরও বিরামহীন সর্পগতি—কর্ম্ম, সংগ্রাম। তার পূর্ব্বে শান্তি কেমন করে সম্ভব? মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সমষ্টির অভিব্যক্তি মানব সমাজে,

কি করে পূর্ণ শান্তি আসতে পারে? না, না,—যতদিন সৃষ্টি আছে, মানুষ আছে, সমাজ আছে, সংগ্রামও থাকবে। সৃষ্টিতত্ত্ব সংগ্রাম। এক যে মুহূর্তে বহু হ'ল তখনই সংগ্রামের সূচনা। জীবনের ভিত্তি, গতি,—সংগ্রামে। কৌপিনধারী বায়ুভুক হয়ে বেঁচে থাকবার জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নি'। বহুর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ সৃষ্ট হয়েছে—আত্মপ্রতিষ্ঠায় বা সে চেষ্টায় তার বেঁচে থাকার সার্থকতা। বিশ্বসংসারে নিয়ত সংগ্রামশীল আবেষ্টনের মধ্যে থেকেও মানুষকে যারা সংগ্রাম হ'তে বিরত থাকতে বলে, অভিসন্ধিপূর্ণ কপট তারা। আত্মপ্রতিষ্ঠা যার হ'য়ে গেছে, সেই চায় প্রকৃতির এই নিদারুণ সংগ্রামশীলতা রুদ্ধ হ'য়ে যাক্, পতিতের অন্তর থেকে স্বাধিকার লাভের জন্য সংগ্রামেচ্ছা চিরতরে তিরোহিত হোক্, যেন যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তার জন্য পতিত উত্থিত না হ'তে পারে, সংগ্রামহীন মানব-সমাজে তার নিজ প্রতিষ্ঠা চিরদিন নিশ্চিন্ত আরামে থাকে।

জগতে তুলনাহীন যে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের বংশধর আমরা, এই তাঁদের শিক্ষা। বিদেশী, বিধর্ম্মী রাজশক্তির রক্তচক্ষুতে ভীত ও তার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ভারতের তামসিক যুগের সকল কপট জ্ঞানীদের কথিত ভারতীয় সংস্কৃতি বা ঐতীহ্য আত্মবান্ ভারতের নয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন 'দাস-ভারতের'। নিকট ভবিষ্যতের 'প্রবুদ্ধ ভারতে' এই সব কপট সন্ন্যাসী ও জ্ঞানীর স্থান হবে জঞ্জালাধারে।

সকাল হ'ল, কনভয়ের সকলেই পরের দিনের সূর্য্যের মুখ আবার দেখ্‌তে পেলো। পূর্ব্ব প্রণালীতে সারা দিনই চল্‌ছি, উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, কুয়াশার গভীরতা ক্রমেই কমে আস্‌ছে। অনেকখানি পথ এগিয়েছি আজ। শত্রুকে এড়িয়েছি, কখনও দলিত মথিত করেছি, এখন অনেকটা সোজা পথে চল্‌ছি পূর্ব্বের তুলনায়। দু'টো দিন, দু'টো

রাত্রি আরও কেটে গেল। অ্যাটলান্টিকের এই বিপুল পরিসর বারিধিতে 'দলবদ্ধ নেকড়ে বাঘের' আক্রমণ আশঙ্কা ক্রমেই ক্ষীণতর হচ্ছে। দৈবাৎ যদি দু' একটির সামনাসামনি পড়া যায় রাস্তাতে, বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে ব'লে মনে হয় না, সদা জাগ্রত আমাদের সঙ্গের শিকারী কুকুর করভেটগুলোর নাসিকা এড়িয়ে। প্রায় সকলেরই তাই অভিমত।

আরো দু'দিন কাটল। হিসেব করছি, মৃত্তিকার মানুষ আমরা কবে আবার মৃত্তিকার মিষ্ট স্পর্শ পাবো—কতদিন লাগবে নিউইয়র্ক পৌঁছুতে। বি, বি, সি, ক্রমেই ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আবহাওয়াও চমৎকার, কুয়াশাও খুব কম। চিরক্রোধী দুর্ব্বাসা উত্তর অ্যাটলান্টিকও কতকটা ঠাণ্ডা! রোদও উঠছে! কী সবুজ জল এ' মহাসমুদ্রের! যেন দ্রবীভূত অকল্পনীয় সুবিশাল মরকত মণি। সে গর্জ্জনও নাই।

বাত্যাহীন সমুদ্রে শীতের ধার এখন অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। হাতে পায়ে সূঁচ বিদ্ধ হচ্ছে না, কিন্তু শৈত্য গভীরতা তেমনই আছে। দিবানিদ্রার পর লেপের তলা থেকে বেরুলেই রাজ্যের শীতলতা এসে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে। তাই বিকেলে দেহের উষ্ণতা সঞ্চার করতে একটু গরম কফি খেতে মেস রুমে গিয়েছি। সুইডেনবাসী তৃতীয় ইঞ্জিনিয়ার দেখি সে রস গ্রহণে ইতিমধ্যে ব্যাপৃত রয়েছে। লোকটি চমৎকার! নাৎসী হস্তে নরওয়ের পতনের আগে থেকে অনেকদিন এ' জাহাজে কাজ কচ্ছিল। অনায়াসেই যুধ্যমান জাহাজে না থেকে যে কোন বন্দরে সুইডিস্ কন্সালের কাছে গেলে তাকে সুইডেনে পাঠাবার বন্দোবস্ত হ'তে পারতো। কিন্তু তা' করে নি। বন্ধুপ্রীতি এর অদ্ভুত। এ' জাহাজের দু'একজনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছে, এদের ছেড়ে যাবে না। নিরপেক্ষ দেশের অধিবাসী হ'য়েও যুদ্ধের সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়ে রয়ে গেছে। ইংরাজী খুব ভাল বলতে পারে না, একলা কখন

আমার সঙ্গে গল্প করতে গেলে সময় সময় মনোভাব প্রকাশের ঠিক কথাটি খুঁজে না পেয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বোঝাবার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হেসে ফেলে। ইঞ্জিন রুমের কঠোরতা ও নীরসতার মধ্যে থেকেও সরস। চমৎকার অ্যাকরডিয়ান বা বগল দোলা হারমনিয়ম বাজায়, বেহালায় ছড়ি টেনে যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে, সকলেই মুগ্ধ হয়, আবার নিপুন চিত্রকর।

টেবিলে তার মুখোমুখী বস্‌তেই কফির পাত্রাধার থেকে আমার পেয়ালায় দারুন ঠাণ্ডায় মনোরম গরম তরল পদার্থটি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, আর কতদিনে নিউ-ইয়র্ক পৌছব জান? 'সিগারের' তো আর কোন ভয় নেই, না? সিগার অর্থ টর্পিডো। দেখ্‌তে অনেকটা ঐ রকম, তাই নাবিক মহলে ঠাট্টার ছলে টর্পিডো সিগার নামে অভিহিত হয়; বোমাকে বলে ডিম, মাইন্‌কে বলা হয় ভাজা ডিম!

বল্‌লাম, শুনিনি তো কিছু, আর কিছু নতুন ছবি আঁকলে এর ভেতর। অস্ফুট 'হুঁ' বলে টেবিল থেকে উঠে চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে গোটান একটা মোটা কাগজ নিয়ে এসে বাধা ফিতেটা খুলে ফেল্‌ল।

বহুবর্ণে চিত্রিত 'আউষ্ট' টর্পিডোর আঘাতে নিমজ্জিত হচ্ছে!!

আমি [illegible]াক্। বল্‌লাম, একি অদ্ভুত খেয়াল হ'ল তোমার? ছেলে[illegible] আমাদের ধারণা ছিল, মনে পড়ে, বৃষ্টি হবে না বললে, হবে! সে ধরণের যুক্তি দিয়ে শিশুর মত নিতান্ত সরল এই যুবকটি বল্‌ল, এটা এঁকেছি তো, দেখো 'আউষ্ট' এর গায়ে কখন টর্পিডো লাগবে না!

যেন অদ্ভুত এই কথাগুলির যাথার্থ্য প্রমানের জন্যই সে রাত্রেই ভীষণ এক অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু প্রায় দুই মাস পরে বহু নাবিকের সঙ্গে আউষ্ট যখন সত্যাই ধ্বংস হ'ল, ভাগ্যক্রমে ঐ লোকটিও আমার মত

অক্ষত দেহে বেঁচে গিয়েছিলো। আক্রমণকারী নাৎসী জার্মান ক্রুজারের পেটের মধ্যে বাইরের আলো, বাতাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অন্ধকার এক কারাকক্ষে ব'সে একে রহস্যভরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কই, তোমার ছবিই যে শেষ পর্য্যন্ত সত্যি হয়ে দাঁড়াল!

ম্লান মুচকি হেসে তথাপি সে বললো, আমাদের জাহাজ তো টর্পিডোর আঘাত পায়নি, ও ছবিটা হয়েছিলো আমার কেবল সেই অস্ত্র বিরোধী!

কথাটা আংশিক সত্য! কিন্তু সমুদ্রের যে অপরূপ প্রশান্ত অবস্থায় আমাদের ওপর ক্রুজারের আক্রমণ হয়েছিলো, টর্পিডোর আঘাত বুঝিবা ছিল ভাল, হয়তো অনেকেই বাঁচতে পারতো। কামানগুলি থেকে নির্ম্মম, অবিরাম গোলা বর্ষনে নাবিক কুল সে ভাবে ছিন্নভিন্ন হ'ত না। অথবা, কে বলতে পারে কি হলে ভাল হ'ত বা হ'ত না।

রাত প্রায় দেড়টায় কোথাও কিছু নেই, জাহাজটি হঠাৎ আচম্‌কা এক দিকে অনেকখানি মোড় ফিরল। আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে উঠতে তীব্র গগনভেদী বিস্ফোরণ শব্দ নিকটবর্ত্তী আকাশ বাতাস প্লাবিত করে দিল। ক্ষীণ চন্দ্রিমার ম্লান আলোতে ব্রীজের ওপর তৃতীয় অফিসারের সতর্ক দৃষ্টি আমাদের জাহাজটিকে বাঁচিয়েছে। তাঁর দৃষ্টি পথে আসে একটি টর্পিডো, জলের ওপর এক শ্বেত পুচ্ছ রচনা করে নিতান্ত উদ্‌গ্রীব প্রেমভরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। চকিতে জাহাজটিকে গতিপথ থেকে ঘুরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমাদের পাশে পাশে ডান দিকে যে জাহাজটি যাচ্ছিল, টর্পিডোটা সেটাকে আঘাত করেছে।

ভেরী লাইট আকাশে উঠল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা যাচ্ছে, কতকগুলি লোক সমুদ্রের ওপর সাঁতার কাটছে।

আক্রমন আমাদের দিক থেকে হয়েছে। সাবমেরিন বিধ্বংশী ৪" ইঞ্চি কামানে গোলা লাগিয়ে অপেক্ষায় আছি সাবমেরিনটাকে দেখা যায়

কিনা। অন্য প্রান্ত থেকে আবার বিস্ফোরণ, ভেরী লাইট। আক্রমণ যেন বাম দিক থেকে দক্ষিণ দিকে স'রে গিয়েছে। আকাশের বহু জায়গায় আবার সেই লাইট। করভেট, ডেষ্ট্রয়ারগুলি, দৌড়োদৌড়ী কচ্ছে।

মিনিট তিরিশ একেবারে নিস্তব্ধ, সমুদ্রের ওপর এখানে সেখানে আগুন জ্বলছে। মধ্যে কিছু জলবোমা নিক্ষিপ্ত হ'ল নানা জায়গায়। দু'খানা ডেষ্ট্রয়ার ঘুরে ঘুরে অনেক নাবিককে তুলছে জল থেকে। পিছন থেকে আবার প্রচণ্ড নিনাদ—আকাশে তুবড়ীর আলো। নানা দিক থেকে উল্‌ক্ প্যাক্ মেথড্ অর্থাৎ নেকড়ের দল যে ভাবে আক্রমণ করে মেষপালকে, সেইভাবে আক্রমণ চল্‌ছে। রক্ষী ডেষ্ট্রয়ার ও করভেটগুলি বিশেষ লক্ষ্য এবার।

কনভয় ভেঙ্গে গেল। দল থেকে আমরা বেগে বেরিয়ে একটা দিকে চল্‌ছি। এত সতর্কতা সত্ত্বেও যখন এদের এড়াতে পার্চ্ছি না, স্থির হ'ল আমরা তখন যেখানে, সেখান থেকে আর এতটুকু আঁকা বাঁকা পথে না গিয়ে, সোজা নিউইয়র্ক। সোজা পথে সময়ের মাত্রা অল্প, কিন্তু বিপদ হবার সম্ভাবনাও অধিক। তা হোক্—৪´´ ইঞ্চি কামানে সব সময় লোক রেখে এগোনো যাক্। তারপর নিয়তি। ঘণ্টা দুই নিরুপদ্রবে এগিয়েছি, আবার কিসের আঘাতে জাহাজটা ভীষণ ভাবে আলোড়িত হ'য়ে উঠল। টর্পিডো? কিন্তু বিস্ফোরণ কোথায়? কাপ্তেন নিজে তখন ব্রীজের ওপর। জলের নীচ থেকে একটি সাবমেরিন সবে বেরিয়েছে ওপরে একেবারে আমাদের জাহাজের মুখের কাছে; কাপ্তেন ওটার ওপর দিয়েই জাহাজ চালিয়ে দিয়েছেন। কি হ'ল দেখবার জন্য আর দাঁড়াই নাই, জাহাজের ল্যাজের ওপর কামানটী প্রস্তুত রেখে পূর্ণগতিতে সোজা পশ্চিমদিকে একক চলেছি। দ্বিতীয় আক্রমন আর হয় নাই,

সাবমেরিনটিকেও আর দেখা যায় নাই। তাই অনুমান অসঙ্গত নয়, অ্যাটলান্টিক গর্ভেই তার চিরস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত বোধ হয় করতে পেরেছিলাম।

প্রভাতেও একই পথ ধরে চলেছি, দ্বিতীয় কাউকে চোখে পড়ছে না, কে কোথায় গেছে, কে জানে।

দিন আট নয় পরে, নিউইয়র্ক থেকে আর মাত্র ৪০০ মাইল দূরে এসে গিয়েছি, অ্যাটলান্টিক নিজ মূর্ত্তি ধারণ করল। কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন সারাদিন, সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝাবাত। দু'দিন দিনে দেখা গেল না সূর্য্যের মুখ, রাত্রে তারকার।

জাহাজ বেয়ারিং হারিয়ে ফেলেছে, সমুদ্রের ঠিক কোথায় বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আরো এগিয়ে যেতে ভয় হচ্ছে, পাছে উপকূলের কাছে কোন নিমজ্জিত পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ি। একই জায়গায় অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে ঠিক হ'ল, বোষ্টনের বেতারকেন্দ্র থেকে বেয়ারিং নেওয়া হবে। নিকটে সাবমেরিন যদি থাকে, থাকুক্।

সমুদ্রে এরূপ কুয়াসা বা অন্য কোন কারণে সূর্য্য বা তারা না দেখতে পেলে হঠাৎ কোন জাহাজ ঠিক কোথায় আছে জানতে হ'লে, কাছাকাছি কোনও বেতার কেন্দ্রকে রেডিও সাহায্যে বলতে হয়, সেখান থেকে রেডিও তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করতে। তা'হলেই রেডিও ডাইরেক্সন্ ফাইণ্ডার যন্ত্রের দ্বারা তরঙ্গগুলির উৎপত্তিস্থল জাহাজের ঠিক কোন দিকে নির্ণয় করা যায়, এবং এভাবে জাহাজটি কোথায় আছে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় বিপদ্ এই যে, সাবমেরিন কাছে থাকলে আমরা যখন বেয়ারিং নিচ্ছি, সেই যন্ত্রও কিছু বেতার তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করবে, এবং সাবমেরিন এই তরঙ্গ ধরে আমরা কোন দিকে আছি টের পেয়ে যাবে।

এতখানি পথ বেপরোয়া সোজা এসে, পাহাড়ের গায়ে আছড়ে না পড়ে আবার নিয়তির ওপর নির্ভর করে নিলাম বেয়ারিং।

নিউইয়র্ক বন্দরের বাইরে এসে পৌঁছে গিয়েছি। আমেরিকান পাইলট জাহাজে উঠে বললেন, অভিনন্দন জানাচ্ছি, খুব ভাগ্যবান আপনারা, গত তিনদিনের মধ্যে একখানা জাহাজও বন্দরে আসে নাই। তাঁর কাছেই শুনলাম, আমেরিকার ওপর যুদ্ধ ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহু নাৎসী সাবমেরিন উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে অনেক জাহাজ ডুবিয়েছে। বন্দরের ২৫ মাইলের মধ্যেও আক্রমণ চালাচ্ছে।

মিত্রশক্তির অস্ত্রগৃহে

বেলা প্রায় ১০টায় নিউইয়র্কের সামনে সমুদ্র মুখ দিয়ে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ নগরীতে প্রবেশ করছি। জলের ওপর থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে এ নগরীর বিলাস ও অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য। বন্দরে প্রবেশ করবার পথে পড়ে স্বাধীনতা দেবীর সুউচ্চ মর্ম্মর প্রতিমা, জলে একটি বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিতা। যেন নতুন এই ভূমিতে অভিজাত-প্রধান য়ুরোপের যে সব মানুষ গৃহের সকল আকর্ষণ উপেক্ষা ক'রে পূর্ব্বযুগে এখানে এসেছিলো অতৃপ্ত আশা আকাঙ্খার পরিণতির প্রত্যাশায়—তাদের পথের ইঙ্গিত। উত্তোলিত-নাসা য়ুরোপীয় আভিজাত্য দেশে এদের স্থান দেয় নাই। 'সাধারণ'-এর মধ্যকার সুপ্রচুর কর্ম্মক্ষমতা ও উন্মুখ প্রতিভা সেখানে বিকাশ পথে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে ঠিকরে এসেছিলো এই নব আবিষ্কৃত বিরাট ভূভাগে। মুক্ত, নির্জ্জন, ভূমির সুবিশাল পরিধিকে তাদের উদ্যোগ দিয়ে অপূর্ব্ব এক দেশে পরিণত করেছে। লক্ষ সম্ভাবনাপূর্ণা রহস্যময়ী কিশোরী এই কুমারী মাটির সঙ্গে পৌরুষের মিলনে পৃথিবীতে ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্য জন্মলাভ করেছে।

বামে, দক্ষিণে, বিচিত্রা সুশোভিতা দ্বীপমালা—মধ্যের জল ভাগের ওপর দিয়ে আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। একটু দূরে আমাদের দক্ষিণে আধুনিক ময়দানব রচিত এ যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ সূর্য্যকিরণে ঝলমল করে উঠল—কোনী দ্বীপ; নিউইয়র্কের ও আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলের লক্ষীর বরপুত্রদের গ্রীষ্মবিলাসের পুরী। নিউইয়র্কের ঐশ্বর্য্য কেন্দ্র মানহাট্টানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেতু ও যান্ত্রিক জলযান দিয়ে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে মানহাট্টানের গগনস্পর্শী অট্টালিকাগুলি—পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে আকাশে উঠেছে। আমেরিকার প্রাচীনতর

অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারদের কাছ থেকে নামে মাত্র মূল্যে ক্রীত জঙ্গলাবৃত খানিকটা জলাভূমি মানহাট্টান, আজ আমেরিকান অক্টোপাসের পৃথিবী ব্যাপী শুঁড়গুলির কেন্দ্র।

সকল দেশের জন সমুদ্রের তলদেশে কত যে অমূল্য মনি মুক্তা রয়েছে, মাত্র চার শতাব্দীতে রচিত আমেরিকা ভূমি তা-ই নির্দ্দেশ করছে। বাধাহীন অবস্থায় কর্ম্মী মানুষের উৎকর্ষতার নিদর্শন।

বেলা প্রায় ১১টায় ব্রুকলিনের 'পায়ারে' জাহাজ বাঁধা হ'ল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এলেন ইমিগ্রেসন বিভাগের কর্ম্মচারীগণ। ফিট্‌ফাট্‌, কায়দাদুরস্ত সব, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আমাদের সকলের পাসপোর্ট পরীক্ষা করলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, ইতিপূর্ব্বে এদেশে এসেছি কিনা, হ্যাঁ, 'আলিয়েন রেজিষ্ট্রেষণ কার্ড কোথায়, দেখানো হ'ল, আমেরিকা ভূমিতে নামবার অনুমতি মিলল।

পৃথিবীর 'স্বর্গভূমির' দ্বাররক্ষক এ'রা। সতর্কতার সীমা নাই, অবাঞ্ছনীয় কেউ যদি প্রবেশ করে বসে। তার ওপর যুদ্ধকাল। নানা দেশের লোক আসছে জাহাজগুলিতে। ফ্রান্সের পৃথিবী বিখ্যাত বিশাল বিলাস জাহাজ 'নরম্যাণ্ডি' বন্দরে ছিল, কে বা কারা কাল পর্শু তাকে আগুন ধরিয়ে নষ্ট করবার প্রয়াস পেয়েছে। বহু আমেরিকানের বিচার চলছে নাৎসীদের গুপ্তচর অভিযোগে। কারো সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ স্থলে, স্থলে নামা তো নিষিদ্ধই, পাঠিয়ে দেয় নিকটবর্ত্তী লং দ্বীপের কারাগারে তদন্ত সাপেক্ষ।

ব্রডওয়ের একটা রাস্তায় বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক ডেম্পসী নিজ নামে এক রেস্তোরাঁ খুলেছে। আমার কানাডাবাসী বন্ধু এবং জাহাজের কাজে সহকারী ভদ্রলোকও নিউইয়র্কে এই প্রথম এসেছেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে একদিন জ্যাক ডেম্পসীর রেস্তোরাঁতে যাবার জন্য বেরুলাম।

ব্রুকলীন পোষ্ট আফিসের কাছে ফুটপাথের পাশে একটা বাড়ীর গা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমেছে রাস্তার নীচে। নেমে দেখি, আরো কয়েক ধাপ, এবং শেষে একটি রেল ষ্টেসন, ভূগর্ভে—নিউ-ইয়র্কের সাবওয়ে বা মাটীর নীচেকার লোক চলাচলের জন্য রেলপথ প্রণালী। টাইম স্কোয়ারে যাব, কিন্তু টিকিট কে কোথায় বেচ্‌ছে? অনেকেই আছে ষ্টেসনে ট্রেণের অপেক্ষায়। দু'জনেই এদিক ওদিক দেখছি। কতকগুলি লোক এক একজন করে প্লাটফরমের গেটের কাছে একটি মুদ্রা যন্ত্রে পাঁচ সেণ্টের একটি করে মুদ্রা ফেলে সামনের বোতাম টিপে ধরছে আর গেট খুলে যাচ্ছে একজনের যাবার মত ফাঁক হয়ে। আমরাও গেলাম, টিকিটের হাঙ্গামা নাই, চেকারও নাই।

টাইম স্কোয়ারে পৌঁছে সিগারেট কিনতে একটা মনোহারী দোকানে ঢুকেছি। সিগারেট চাইতে একটি মুদ্রা যন্ত্র দেখিয়ে দিল। আলমারীর মত সামনে পেটের কাছে ছোট্ট একটি দেরাজ বেরিয়ে রয়েছে, পাশে পয়সা ফেলবার মত একটা জানালা আর একটা বোতাম। দুটো নিকেল অর্থাৎ দশ সেণ্টের টুকরো ভেতরে গলিয়ে দিয়ে বোতাম টিপলাম, আল-মারীটার পেট থেকে দেরাজের মধ্যে এসে পড়ল এক প্যাকেটে কুড়িটা সিগারেট, প্যাকেটের গায়ে তিন সেণ্টের তিন টুকরো অভ্র দিয়ে সযত্নে মোড়া ফিরতি পয়সা, আর বারুদ মাখান একটি ভারী কাগজে আঁটা কুড়িটি সিগারেটের জন্য কুড়িটি দেশলাইএর কাঠী!

জানি না এত কাণ্ড না করে অন্য পাঁচ রকম জিনিষের মত এ জিনিষটা বেচতে কি অসুবিধা! কল বিগড়ে গেলে তা-ই করে থাকে। বোধ হয় দোকানের শোভা, কারণ অনেক জায়গায় আবার এ যন্ত্রটি নাই।

ডেম্প্‌সীর রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করে আমার বন্ধুটির এতক্ষণে চোখ খুল্‌লো। সব জিনিষই চারগুণ দাম! বিচিত্র আলোক মালা সজ্জিত বিলাস

ভবন যেন। সযত্নচর্যিতা সুন্দরী পরিচারিকাদের এক ডলারের খাদ্যদ্রব্য চার ডলারে পেটে পৌঁছে দেবার সে কী সুমিষ্ট আগ্রহ! আমার হঠাৎ একটা চলচ্চিত্র দেখবার বিশেষ তাড়া পড়ে গেল, বন্ধুটিরও! তার সাধ মিটেছে।

বন্দরে ঢোকবার সময় বাইরে থেকে যা মনে হয়েছিলো ভিতরে এসে দেখলাম অনেক কিছু গিল্‌টি করা! নিউইয়র্কের সব অধিবাসী-ই মানহাট্টানের কোটিপতি নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে আর এক নতুন আভিজাত্যের রাজত্ব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধকাল, জনসাধারণের কাজ সবারই আছে। নতুবা অন্য সময়ে বেকার সমস্যা প্রবল হ'য়ে থাকে। ঠিক ভারতের সহরের বস্তীগুলির মত পশুবাসেরও অযোগ্য বস্তী অঞ্চল নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের বাসের জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহগুলি মানহাট্টান, কোনী দ্বীপের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। ব্রুকলীন অঞ্চল দেখে নিউইয়র্কের চোখ ঝল্‌সান বন্দোবস্তে মনে হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা দেবী নিতান্ত কুৎসিতা—জড়োয়া গহনায় ও শাড়ীর বাহারে অঙ্গ ঢেকে রেখেছেন।

বিভিন্ন ভাষা ভাষী য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত নর নারীতে বর্ত্তমান আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রগুলি গড়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলা হয়, এদেশের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইংরাজী ভিন্ন আর সব ভাষা অচল, রাষ্ট্রবিধি অনুযায়ী। অন্য কোন দেশের কোন লোককে এদেশের নাগরিক হ'তে গেলে যে সব বিধি অবশ্য পালনীয়, তার প্রথম সর্ত্তই হচ্ছে, নিজ ভাষা সম্পূর্ণ ভুলে ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করতে হবে গৃহেও, বাইরে তো বটেই। বোধ হয়, প্রথম ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বৃটিশ জাতি উদ্ভূতদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল, তার জোরেই ইংরাজী চলেছিলো অল্প-সংখ্যক অন্য দেশীয় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা চূর্ণ করে।

কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান ১৩ কোটি লোকসংখ্যার অধিকাংশ কোন হিসাবেই এখন বৃটিশ রক্তে সমুদ্ভূত নয়। তথাপি জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং ইংরাজীর মিশ্রণে নতুন কোন সকলের গ্রহণযোগ্য ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা দূরে থাকুক, সে কথা উত্থাপনও অপরাধজনক। জাহাজে দেখতাম, নরউইজিয়ান রক্তের আমেরিকানরা প্রায়ই আসতো নরউইজিয়ান-দের ভাষায় কথাবার্ত্তা বলার জন্যই শুধু বাইরে ইংরাজীভাষী আমেরিকান, অন্তরে ষোলো আনা নরউইজিয়ান। জার্ম্মান, ইতালিয়ান প্রভৃতি অন্য রক্তের আমেরিকানও তাই। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের কঠোর শাসনে মুখটি বুজে থাকতে হয়। বহু কোটি মানুষের জন্মগত প্রাথমিক অধিকার আপনার মাতৃভাষা বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে, মুষ্টিমেয় ইংরাজী ভাষাভাষী ও তাদের করুণা ভিক্ষার্থী য়ুরোপের ক্ষুদ্র জাতিগুলির রক্তে গঠিত আমেরিকানরা রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণ করতলগত রেখেছে। এই ভাষার একত্বের জন্যই অসন্দিগ্ধ সাধারণ আমেরিকাবাসী অনেক সময় ইংল্যাণ্ডকে স্বজাতিয়ের দেশ বলে ধারণা করে, অন্য জাতির তুলনায় ইংরাজকে নিকটতর আত্মীয় মনে করে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা তাই আসলে হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটি বিশিষ্ট জাতি সমুদ্ভূত কতকগুলি লোকের দ্বারা অন্য রক্তোদ্ভূত আমেরিকানদের ভাষা ও পিতৃ পরিচয় ধ্বংশ করার স্বাধীনতা।

যুদ্ধের সময় এই সযত্নে আবরিত আসল তথ্যটি নগ্নরূপেই চার্চ্চিলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, যখন তিনি ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলির দ্বারা পৃথিবী শাসনের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে পড়লেন, এখনও আছেন।

আমেরিকাবিলাসী এদেশের একশ্রেণীর নির্ব্বোধের অযথা সে দেশে উল্লম্ফন লক্ষ্য করেই এত কথা বললাম।

বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যেই আমেরিকার জনসংখ্যা ত্রিশ কোটিতে নিয়ে যাওয়া সেখানকার সমাজপতিদের প্রোগ্রাম। অনেক পত্রিকায় এ' বিষয় বহু প্রবন্ধ লক্ষ্য করেছি। ম্যাস্ প্রোডাকসন্ প্রজনন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যও বেশ পরিষ্কার বোঝান হ'ত। নতুবা ঘুমন্ত বিশালদেহ প্রাচ্য দৈত্যটির বুকের ওপর বসে চিরকাল নর্ত্তন চলবে না। তার ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ইংরাজী ভাষাভাষীদের পৌত্র প্রপৌত্রকুলে ধরাবক্ষ ছেয়ে যাক্!

তখন আমেরিকার একজন বৃদ্ধ সিনেটর তার উনিশ বর্ষ বয়স্কা সুন্দরী তরুণী সেক্রেটারীর ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলো, ১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে। সব সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে বেরুতো 'মৃত্যুদণ্ডোপযুক্ত অভিযোগে সিনেটর অভিযুক্ত'। নব অভিজাত শ্রেণীভুক্ত এই লোকটির বৃদ্ধা স্ত্রী প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন স্বামীকে ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে বাঁচাতে। মেয়েটির বাড়ীতে গিয়ে অভিযোগ সত্য ব'লে প্রমানিত হ'লে যে তাঁর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড হবে, সে কথা ব'লে চেষ্টা করেছিলেন যাতে সে দয়ার্দ্রা হ'য়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করে। কিন্তু সরকার পক্ষ জানতে পেরে সে চেষ্টার পথ রুদ্ধ করে। কি হ'লো শেষ পর্য্যন্ত, জানি না। তার আগেই নিউইয়র্ক ছাড়ি।

আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের ওপর পাশবিক অত্যাচার প্রাণদণ্ডে দণ্ডার্হ। প্রাচীন ভারতের রীতি তবে বিংশ শতাব্দীতেও চলতে কোন বাধা নাই! এদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নের সময় মনে রাখা দরকার।

পার্লহারবারের জাপানী আক্রমণের বিস্ময় ও বেদনায় তখন আমেরিকার জনসাধারণ আচ্ছন্ন। সমুদায় প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ব্বত্রই জাপানীরা দাবানলের মত বিস্তৃতি লাভ করেছে। জাতির মনে আত্ম-

প্রত্যয় সুদৃঢ় রাখবার যে নীতি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই অনুসরণ করে, আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সেই নীতির ফলে আমেরিকাবাসী চিরদিন শুনেছে ও বিশ্বাস করেছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি তারা, কেউ কখন আক্রমণের কথা ভাবতেই পারে না। আমেরিকা আক্রমণ অর্থ, আমেরিকার ওয়াল ষ্ট্রীটের স্বার্থ যেখানে যেখানে আছে সে সব স্থানও। ক্ষুদ্র জাপান যে তাকে কোনদিন প্রকাশ্যে এমন আঘাত দিতে পারে বা সে ক্ষমতা জাপানের আছে, কোনদিন তা'রা কল্পনাও করে নাই। বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সুরু থেকেই আমেরিকাবাসীরা শুনছিলো, 'প্রশান্ত মহা-সাগরের রণতরী বহর' প্রয়োজন হ'লে জাপানকে শায়েস্তা করবার পক্ষে যথেষ্ট, যেমন আজকাল আণবিক বোমার জুজুর ভয় দুনিয়ার সবাইকে দেখান হচ্ছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এমন কথাও অনেকবার বহুভাবে বলেছিলেন, জাপান যদি হঠকারীতা ক'রে যুদ্ধে এসেই পড়ে, এই শক্তিশালী নৌ-বহর তিন সপ্তাহের মধ্যে তাকে নক্ অফ্ ক'রে দেবে। প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

আমেরিকার রাষ্ট্রকর্ণধারদের উক্তিতে ও ব্যবহারে স্পষ্টই দেখা যায়, সুস্থ আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে দুর্জ্জয় অভিমান ও অহঙ্কার তাদের গ্রাস করেছিলো। তাই জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বৃটেনের সে সময়ের রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারের মানসিক উদ্বেগ নিবারণের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট বলেছিলেন, পূর্ব্বোক্ত মহাশয় ব্যক্তি যেন এ বিষয়ে বৃথা চিন্তা ক'রে শরীর নাশ না করেন! সুদূর প্রাচ্যের দুর্ব্বিনীত বালকটির পিঠ চাপড়ে দেবেন, যেন বেয়াদবী না ক'রে বসে!

মধ্যে মধ্যে তাই প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লেও, আমেরিকান্‌দের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো, এ'তে গুরুত্ব তেমন কিছু নেই। যুদ্ধ যদি হয়-ই, নাবালক প্রাচ্য জাতিগুলির

মধ্যে অকালপক্ক এই পীত শিশু অকস্মাৎ যদি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ রূপ ছেলেমানুষী ক'রে বসেই, পার্ল হারবার থেকে কিছু রণতরী টোকিওতে গিয়ে ওদের কান ম'লে দিয়ে এলেই চল্‌বে। জাপান যে এত শীঘ্র সত্যই শেষ পর্য্যন্ত গুরু মারা বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে সারা এসিয়াটাই গ্রাস করতে চাইবে, আমেরিকার জনসাধারণ কল্পনাও করে নাই।

সেজন্য একদিন সকালে উঠে যখন শুন্‌ল পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণের কথা, তা'রা বিস্মিতই হয়েছিলো। সে আক্রমণের তীব্রতা ও নির্ম্মমতা যে কতখানি, সে দিন তাদের জানানো হয় নাই। তথাপি, ক্রমে অতি অল্পকালের মধ্যেই আমেরিকানরা জানতে পারলো, ঐ আক্রমণ নেহাৎ শিশুর হঠকারীতা নয়। দিনের পর দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত, জাপানীদের কর্ণমর্দ্দনের পরিবর্ত্তে তারা শুন্‌ছিল অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎ গতিতে জাপানী অগ্নি সারা প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে ছড়িয়ে পড়্‌ছে, জাপানী মেরিন অর্থাৎ নৌ-সৈন্যেরা একটির পর একটি ক'রে এই মহাসাগরের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হেলায় আয়ত্ত ক'রে ফেল্‌ছে। স্বভাবতই আমেরিকার সকল দিক থেকে এক প্রশ্ন জাগ্‌ল 'আমেরিকার নৌবহর কোথায়?' 'বিপুল শক্তিশালী প্রশান্ত নৌ-বহর কি কর্চ্ছে।' নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কদের রেখে ঢেকে বল্‌তে হ'ল, 'বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ জাপানী আক্রমণে পার্ল হারবারে এ' বহরের সর্ব্বনাশ ঘটেছে। প্রতিশোধ নাও।'

আমি নিউইয়র্কে পৌঁছি ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ সালে। ইতিমধ্যে, কেবল প্রশান্ত মহাসাগর নয়, ভারতবর্ষ ও চুংকিং চীন ছাড়া এশিয়ার প্রায় সকল ভূখণ্ডই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে জাপানী অধিকারে এসে গিয়েছে। ইন্দোচীন, মালয়, থাইল্যাণ্ড জাপানের কুক্ষিগত। ব্রহ্মের সীমান্তও অতিক্রম করে টেন্‌নো হেইকার সৈন্যদল স্বর্ণপ্যাগোডার দেশে

প্রবেশ করেছে। আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি ইংল্যাণ্ডের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে অনেকানেক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। সিঙ্গাপুরের পতন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের লেখক লিখেছিলেন, যুদ্ধের পূর্ব্বে শান্তির সময় নাকি জনৈক সিঙ্গাপুরস্থিত আমেরিকান সংবাদদাতা সিঙ্গাপুর রক্ষার বে-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, যদিও সমুদ্রবক্ষ বা সম্মুখভাগ দিয়ে কোন আক্রমণ হ'লে, প্রতিরোধের ভাল ব্যবস্থা বর্ত্তমান, পশ্চাদ্ভাগ বা মালয় উপদ্বীপের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আক্রমণ হ'লে প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই এখানে ছিল না। তাই এ'দিক দিয়ে এই বিখ্যাত নৌ-দুর্গ আক্রমণের সম্ভাবনা উপেক্ষা করা যায় না। প্রবন্ধটী সামরিক বিষয়। সুতরাং, রীতি অনুযায়ী, আমেরিকার কাগজগুলিতে পাঠাবার পূর্ব্বে সেন্সর হবার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিলো। সিঙ্গাপুরের তদ্‌কালীন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সেই সংবাদদাতাটিকে বলেন যে তাঁর কথাগুলি অর্থাৎ মালয়ের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোন শত্রু কর্ত্তৃক সিঙ্গাপুর আক্রমণ এত উদ্ভট, যে তাঁরা সেই সামরিক প্রবন্ধ আমেরিকায় পাঠাতে অনুমতি দিলেন। লেখক নিজেই এই অসম্ভব ব্যাপারের সম্ভাবনার কথা বলে হাস্যাস্পদ হ'লেন বিজ্ঞ সমাজে!

মালয় উপদ্বীপে জাপানী আক্রমণের সময় স্থানীয় জনসাধারণ নাকি দেশের ভেতর থেকে আক্রমণকারীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো। সে কথার উল্লেখ করে নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সংবাদ পত্রগুলি লিখছিল, ইংরাজ বণিকদের ও মালয়ের অন্য শ্রেণীর ইংরাজদের নীচতা, অসাধুতা ও লোভের জন্য মালয়বাসীরা এত উত্ত্যক্ত হ'য়ে উঠেছে, যে জাপানীদের সাহায্য করেছে এই গৃধ্নতা থেকে বাঁচবার জন্য। জানিনা, প্রবন্ধগুলো পড়ে বিলাতের সংবাদপত্রগুলো আবার ফিলিপাইন সম্বন্ধে কিছু লেখার চেষ্টা করেছিলো কিনা!

জেনারেল পার্সিভালের সিঙ্গাপুরে ফোর্ডের কারখানায় জাপানী সেনাপতি ইয়ামাসিতার কাছে আত্মসমর্পনের দৃশ্যটি, ভগবান জানেন ওরা কি ক'রে পেল, অথবা সত্য কিনা, এই দুই সেনাপতির মধ্যে হুবহু কথাবার্ত্তাগুলি একটি কাগজে দেখেছিলাম। মর্ম্মার্থ হচ্ছে, পার্সিভাল ইয়ামাসিতার কাছে এসে চান যুদ্ধবিরতি কিছু সময়ের জন্য, যাতে ইতিমধ্যে বিলাতের বড়কর্ত্তাদের সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তা বল্‌তে পারেন। কিন্তু ইয়ামাসিতা কঠোরভাবে তাঁকে সেই মূহুর্ত্তে বৃথা বাক্যব্যয় না করে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। বলেন, আমি দুটো শব্দের কেবল একটি শব্দ শুন্‌তে চাই—'হাঁ' বা 'না'। পার্সিভাল মৃদু কণ্ঠে বল্‌লেন, 'হাঁ'!

জাতির দুর্গতি জাতি যেন উপভোগ করছিল! 'গালভরা বৃটিশ সাম্রাজ্য, সূর্য্য যেখানে অস্ত যায় না,'—এ'র জীবন কাঠি এবং মরণ কাঠি যে সম্পূর্ণরূপে এখন আমেরিকার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর, জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপেই বুঝেছিলো এবং বেশ একটু মোলায়েম আত্মতৃপ্তি লাভ কর্চ্ছিল!

কতকগুলি কাগজে স্পষ্টই লিখছিল, ইংল্যাণ্ডের অদূরদর্শীতা, কাপুরুষতা এবং বিশ্বগ্রাসী লোভের জন্যই আজ জাপানীরা বাড়বানলের মত এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপাইনে আমেরিকান সৈন্যদের বীরত্ব কথা এবং ফিলিপিনো স্কাউটদের জাপানী ঘৃণা ও মৃত্যুপণ যুদ্ধের কথা প্রচারিত হচ্ছিল।

কিন্তু বৃথা পরস্পরের মধ্যে কথা কাটাকাটিতে তো জাপানাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে না। তাই সারা আমেরিকায় তোলা হ'ল এক ধ্বনি—'পার্ল হারবারের প্রতিশোধ নাও।' 'পীত আক্রমণ রোধ করতে সমস্ত আমেরিকান একত্রিত হও।' নতুবা, আমেরিকা পর্য্যন্ত জাপানী আক্রমণ প্রসারিত হ'তে পারে। রাস্তা, ঘাট, রেস্তোরাঁ, প্রেক্ষাগৃহ, সর্ব্বত্র এক

গান, 'মনে রেখো পার্ল হারবার।' মেয়েদের বুকে আঁটা, 'মনে রেখো পার্ল হারবার।' আমেরিকার সর্ব্বত্র তখন এক বাণী, 'মনে রেখো পার্ল হারবার।'

এই একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত আমেরিকা এক হ'য়ে গেল। যে লিণ্ডবার্গকে তাঁর জার্ম্মানপ্রিয়তার জন্য, আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে ইংরাজ নীতির সমর্থক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, 'সর্প' নামে প্রকাশ্যে অভিহিত করেছিলেন এবং লিণ্ডবার্গও রুজভেল্টকে ঐ ধরণেরই আর এক বিশেষ্যে সম্ভাষিত করেছিলেন—সেই লিণ্ডবার্গ রুজভেল্টকে ব্যক্তিগত চিঠি দিলেন, এখন হ'তে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রেসিডেণ্টের হাতে ছেড়ে দিলেন। পীত মানুষগুলির সঙ্গে যুদ্ধে এই বিখ্যাত বহু ক্রোড়-পতি বৈমানিক বিমান বিভাগে পাইলট রূপে যোগ দিতে চাইলেন।

পৃথিবী বক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য অবিনশ্বর রাখবার নিতান্ত হাস্যাস্পদ চেষ্টায় আমেরিকার যে উপদলটি জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের সুরু থেকে আমেরিকাবাসীদের প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করছিল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জন্য, এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে পার্চ্ছিল না, পার্ল হারবারে পীত আক্রমণ মন্ত্রের মত সে কাজ সমাধা করল। ছয়মাস আগে যখন এই আমেরিকায় আসি কানাডা যাবার পথে, তখন দেখে-ছিলাম কয়েকটি পত্রিকায়, আমেরিকার য়ুরোপের যুদ্ধে যোগদানের কোন সম্ভাবণার বিরুদ্ধে কী তীব্র সমালোচনা! 'রিডার্স ডাইজেষ্ট' নামে একটি ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিলো এই কথাগুলি—'হিটলার ১০০০ বৎসর পৃথিবীতে জার্ম্মানীর আধিপত্য চালাতে চায়; আমাদের কর্ণেল নক্স ১০০ বৎসরের জন্য ইংরাজকে সপ্ত সমুদ্রের আধিপত্য দিতে চান। তাহ'লে দু'জনের পার্থক্য কেবল সময়ের পরিমাণে!" কর্ণেল নক্স যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

আর আজ ছয়মাস পরে, বিভিন্ন য়ুরোপীয় রক্তসমুদ্ভুত আমেরিকার জনমত সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। বিজাতীয় ঘৃণা তাদের একসূত্রে গ্রথিত করে ফেলেছে।

মৃত্যুশয্যায়, পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'দুরাত্মারা চটৎকারশীল বহ্নির ন্যায় সদা জাগরূক থাকে'। জাতির এই মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে অমনি নিউইয়র্কের বহু প্রচারিত এক শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদী পরিপোষক সংবাদপত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একদিন জাপানীদের প্রায় ভারতের দ্বার পর্য্যন্ত অভিযান সম্বন্ধে লিখলো, 'বাইরের এই সংঘাতে ভারতবর্ষের বাদামী রংএর জাতিগুলির চোখ খুলে গিয়ে শ্বেতের প্রভুত্ব ও শ্বেতকর্ত্তৃক পৃথিবী ভোগ দখল বিপন্ন হ'বে!' কথাগুলিতে নাবালকের দায়িত্ব নেবার বিরক্তিকর ভণ্ডামী নাই, আছে জাতি ও বর্ণবিদ্বেষের বীভৎস নগ্নরূপ; আমেরিকান রাষ্ট্রনীতির খোলাখুলি কথা। ভারত 'প্রবুদ্ধ' হ'লে যে পৃথিবীতে চিরতরে চক্র-বিশেষের অত্যাচার ও স্পর্দ্ধা স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, সেই ভীতি; অন্ধকারের ত্রাস প্রভাতের সম্ভাবনায়। ১৩ কোটি আমেরিকানকে কি ভাবে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী ঘৃণিত বিষে দূষিত করে, তার একটি দৃষ্টান্ত।

জাতিতে জাতিতে সম্বন্ধ শেষ পর্য্যন্ত জাতিগুলির রাষ্ট্রনীতির দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়, ব্যক্তি বিশেষদের পতিতের জন্য শুভেচ্ছার কোন মূল্যই নাই। বরং, এই সব শুভেচ্ছায় পতিতের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমেরিকার কার্য্যকরী সাহায্যের জন্য প্রচার কার্য্য, নিছক মস্তিষ্ক প্রেরোচনা ছাড়া আর কিছু নয়।

পার্ল হারবারের প্রতিশোধ নেবার জন্য একদিকে সৃষ্টি হ'ল যুদ্ধোপযোগী বিপুল ও তীব্র ঘৃণাভাব, অন্যদিকে চললো সুবিশাল রণসজ্জা

নির্ম্মাণের নিখুঁত ব্যবস্থা। কেবল চীৎকারে, বা নর্ত্তনে, বা বাণী আউড়ে শত্রুর বেয়নেটের ধার ভোঁতা হবে না। অস্ত্র চাই, যুদ্ধের এ' অবস্থায় নিরুপদ্রবে অস্ত্র নির্ম্মাণ কেবল আমেরিকাতেই, শত্রুর বোমাবর্ষী বিমানগুলির নাগালের বাইরেই সম্ভব। আমেরিকাকে হ'তে হবে 'মিত্রশক্তির অস্ত্রগৃহ।' অমানুষিক ঘৃণাকে ধ্বংশকার্য্যে নিয়োগে অস্ত্রের প্রয়োজন। সুচিন্তিত, সুসংবদ্ধ এবং শান্ত কর্ম্মপদ্ধতিতে ১৯৪৪এর মধ্যেই সুবিশাল আমেরিকান্ কারখানাগুলিকে যথেষ্ট কামান, বন্দুক, বিমান, জাহাজ, রণতরী, ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করে ফেলতে হবে। তারপর সুরু হবে 'আসল যুদ্ধ বা প্রতি আক্রমণ', যখন প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিটি শত্রু কামান, ট্যাঙ্ক, বিমানের বিরুদ্ধে আসবে তার তিনগুণ, চারগুণ তেমনই অস্ত্র, এই 'মিত্রশক্তির অস্ত্রগৃহ' হ'তে।

তথাপি সে এখনও কিছু দূরের কথা। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব উপকূলে জার্ম্মানীর সাবমেরিনগুলি আমেরিকাকে তার ঘরোয়া সমুদ্রেই ঘিরে রেখেছে। অ্যাটলান্টিক তীরবর্ত্তী বন্দরগুলিতে নিয়মিত আর জাহাজ চলাচল হ'তে পার্চ্ছে না। কানাডার নদী বিশেষের মধ্যে ঢুকেও নাৎসী সাবমেরিন আক্রমণ চালিয়েছে। ওয়েষ্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ ও আমেরিকান নৌ-ঘাঁটির নাকের কাছে এসে ভেসে উঠে কয়েকটি দ্বীপে এই সাবমেরিন কামান চালিয়ে স্থলবর্ত্তী তেলের ডিপো প্রভৃতি ধ্বংস করেছে! প্রত্যহই জাহাজডুবির খবর আসছে। এত কাছে, যে একদিন একজন আমেরিকান গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে বলে বসলো, কোন দিন শুন্‌বো স্বাধীনতা প্রতিমা নাৎসীরা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে!

আমাদের জাহাজের আট দশ জন নরউইজিয়ান নাবিক স্কটল্যাণ্ডের লীথ বন্দরে এ জাহাজ ছেড়ে অন্য একটি জাহাজে কাজ নেয়। এ'টা পুরোনো জাহাজ, টর্পিডো লাগলে বেশীক্ষণ টিঁকবে না, তাই নতুন

জাহাজে গিয়েছিল! একদিন সকালের কাগজগুলিতে দেখি, এদের মধ্যে দু'জনের ছবি বেরিয়েছে এবং যে বিপদের মুখ থেকে এরা বেঁচে উঠেছে সেই বিবরণ। নিউইয়র্ক থেকে মাত্র ১০০ মাইলের মধ্যে এদের নতুন জাহাজটির টর্পিডো আক্রমনে সমুদ্রসমাধি হয়। জাহাজের প্রায় বার জন নাবিক একটি জীবন তরীতে উঠে তখনকার মত রক্ষা পায়। জীবন তরীতে আহার্য্য ও জল ছিল যা', দু'দিনেই শেষ হয়। তারপর বাত্যাবিক্ষুব্ধ অ্যাটলান্টিকের ওপর ভীষণ ঠাণ্ডায়, অনাহারে, অনিদ্রায় ও জলাভাবে একে একে এই দু'জন ছাড়া আর সকলেই মারা যায়। হাঙ্গর সমাকীর্ণ সমুদ্রে বন্ধুদের মৃতদেহগুলি সমুদ্রে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে এই হিংস্র সামুদ্রিক মৎস্যগুলি টুকরো করে ছিঁড়ে খাচ্ছিলো সে দৃশ্য এরা দেখেছে। মাছগুলি এই শেষ দু'টি মানুষের জন্য অবিরাম জীবন তরীটির আসে পাশে কিলবিল করছিল। নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে অবশেষে প্রায় দিন দশ পরে উপকূলরক্ষী একটি জাহাজ এদের ভাগ্যক্রমে দেখে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে।

এ অবস্থায় আমেরিকায় একটা সন্ত্রস্ত ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঠিক সেই মূহুর্ত্তে প্রশান্ত ও অ্যাটলান্টিক এই উভয় মহাসাগরে এবং গৃহের সামনেই পীত ও নাৎসী স্পর্দ্ধা দমন করবার যথেষ্ট শক্তি দেশের নাই। অক্ষমতা থেকে অবসাদ এসে জন সাধারণকে গ্রাস না করতে পারে, তাই নিয়ত নানাভাবে বলা হ'ত, অতি নিকট ভবিষ্যতে আমেরিকায় বিরাট অস্ত্র সজ্জা সম্ভাবনার কথা। প্রবন্ধে, গল্পে, চিত্রে, ইথার তরঙ্গে, পাশাপাশি চলছিল 'পার্ল হারবার' এবং শত্রুকে অবশেষে অস্ত্র সংখ্যায় অভিভূত করবার জন্য আমেরিকাকে যে 'মিত্রশক্তির অস্ত্রগৃহে' পরিণত করা হচ্ছে, সেই কথা। এই অস্ত্রগৃহের প্রোগ্রাম ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার বিমান ও ৮০ হাজার ট্যাঙ্ক।

তখনও পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে—ইংল্যাণ্ডে, আফ্রিকায়, রুষিয়ায়, ভারতবর্ষে—এখান থেকে বহু অস্ত্র শস্ত্র যাচ্ছিল। আমাদের জাহাজও বোঝাই হ'ল নব-নির্ম্মিত বহু ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণে, ডেকের ওপরও বাদ নেই। সেখানে রাখা হ'ল বহু সহস্র গ্যালন পেট্রলের পিপে। সব জাহাজকেই তখন অন্য জিনিষের সঙ্গে কিছু কিছু সমর-সম্ভারও বহন করতে হ'ত। আমেরিকার অ্যাটলান্টিক তীরবর্ত্তী বন্দরগুলি থেকে এ' সব যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যারা দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পথে আফ্রিকা, পারস্য বা ভারতবর্ষের দিকে যেত, তাদের 'কনভয়ে'এ পৌঁছে দেওয়া হ'ত না। পৃথিবীর সকল সমুদ্রে কনভয় নেবার মত রক্ষী জাহাজ মিত্রশক্তির নাই। একে একে এই পোত-গুলিকে দুস্তর বারিধি বক্ষের বিভিন্ন স্থান দিয়ে গন্তব্যস্থানে যাওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ত। কিছু কিছু, যত কমই হো'ক, গিয়ে পৌঁছুবে। যতদিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট শক্তিশালী বিভিন্ন প্রকারের রণতরী ও বিমান আমেরিকার জাহাজ নির্ম্মাণের ইয়ার্ড ও কারখানাগুলি থেকে বেরুতে না পার্চ্ছে, দ্বিতীয় উপায় নাই।

বহু ক্ষতি স্বীকার করেও মিত্রপক্ষের দেশগুলির মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ রাখতে হবে। রুশিয়া বা অন্যান্য রণাঙ্গনগুলিতে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জলপথে নাৎসী ব্যূহ ভেদ করে পৌঁছুচ্ছে, তার সামরিক কার্য্যকারীতা বিশেষ তেমন কিছুই নয়। বিশেষ করে রুশিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রগুলির অভাবনীয় ধ্বংসলীলার মধ্যে দু' চারশ' আমেরিকান ট্যাঙ্ক বা বিমানের মূল্য সমুদ্রে গোষ্পদের মত। অস্ত্র সরবরাহের জন্য আমেরিকার মুখাপেক্ষী হ'লে রুশিয়ার নেতৃবর্গকে ১৯৪১ সালের মধ্যেই, ইউরাল পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে গিয়ে নাৎসীদের বিরুদ্ধে নব প্রণালীতে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হ'তে হ'ত। প্রকৃতপক্ষে, সোভিয়েট আমেরিকার

মুখাপেক্ষী ছিল না; ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাই সোভিয়েটের দিকে চেয়ে ছিল। ফ্রান্সের মত ত্বড়িৎগতিতে সোভিয়েটের পতন হ'লে, আমেরিকা প্রস্তুত হবার অবকাশ একেবারেই পে'ত কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

তথাপি যতটুকু যুদ্ধ সরঞ্জামই শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার বন্দরগুলি ছেড়ে সমুদ্রপারে বিভিন্ন দেশগুলিতে গিয়ে পৌছুক্ না কেন, জাহাজ চলাচল বন্ধ করা চলতে পারে না। উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রগুলিতে নাৎসী সাবমেরিনগুলিকে দমনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত কিছু সময়ের জন্য সমুদ্রপথের ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করলেও সামরিক দিক দিয়ে বিচারে বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু এ'র ফলে, মিত্রপক্ষের দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে আসত চরম নৈরাশ্য। তারা ভাবত, চূড়ান্ত পরাজয় প্রায় এসেই গিয়েছে। পরে, উপযুক্ত মূহুর্ত্তে অস্ত্রসজ্জার আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লে আর এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আনা সম্ভব হ'ত না। অপর দিকে, এ সংবাদ নাৎসী জগতের মানুষগুলির মধ্যে এনে ফেলতো আরো বেশী উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যুদ্ধজয়ে প্রগাঢ় নিষ্ঠা।

তাই সমুদ্রপথ যেমনই হোক না কেন, নাবিকদের জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবেই, সাবমেরিন দমনের ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষায় থাকলে চলবে না।

পশ্চিম, মধ্য, দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকের রণাঙ্গনে

৫ই মার্চ্চ ১৯৪২, আমাদের যাত্রার দিন ঠিক হ'ল। বন্দরে জাহাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই এসে তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন, নিরাপদে যেন কেপটাউন পৌছতে পারি। সকলেই দেখি আমাদের মুখের দিকে বেশ একটু অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে আছে! সেদিনই সকালের সংবাদ পত্রে খবর বেরিয়েছে নিউইয়র্ক থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে সাবমেরিন আক্রমণে একখানি জাহাজ নিমজ্জিত হয়েছে; নাবিকদের কোন খবরই নাই। আমাদের জাহাজের অনেক অফিসার এখানে এই জাহাজের কাজ ছেড়ে দিল। তারা এ দিকটার চেয়ে এখন উত্তর অ্যাটল্যান্টিক-গামী জাহাজই পছন্দ করল। তাদের দৃঢ় ধারণা, ভারতবর্ষের দিকের সমুদ্র এখন উত্তর অ্যাটলান্টিকের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ, শেষোক্ত সমুদ্রে জাহাজগুলি রণতরীর রক্ষণাবেক্ষণে কনভয়এ যায়—দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক ও ভারত মহা সাগরে সে সুবিধা নাই, তখন পর্য্যন্ত ছিল না।

কোন পথ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়া হবে, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা হচ্ছে। নবাগত চীফ অফিসার একদিন বল্লেন, আমরা উপকূলের পাশ দিয়ে দিয়ে যাব দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্টিনা পর্য্যন্ত। তারপর ওখান থেকে দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক পার হ'য়ে ওপারে কেপটাউন। কিন্তু আগেই বলেছি, রাস্তার কথা কারুরই বন্দরে বসে জানবার উপায় নাই, নৌ-বহরের কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন। বিভিন্ন জায়গা থেকে যুদ্ধের ফলে যে সব জাহাজ ডুবির খবর আসে, সুবৃহৎ সমুদ্রের মানচিত্রের গায়ে সেই সেই বিশিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে তারা একটা আন্দাজ করে নেয় সাবমেরিণ আক্রমণ সাধারণতঃ কোন জায়গাগুলোতে হচ্ছে। একক যে সব জাহাজ অ্যাটলান্টিকের অপর প্রান্ত থেকে নিরাপদে এসে বন্দরে পৌছুচ্ছে সেই

সব জাহাজের কাপ্তেনদের নৌ কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে হয় পথের খবর; রাস্তায় কোন প্রকারের আক্রমণের মুখ থেকে বেঁচে এলে সমুদ্রের ঠিক সেই স্থানটি দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষাংশ দিয়ে বোঝাতে হয়। যুদ্ধকালে ইথার তরঙ্গ থাকে সমুদ্রের ওপর নীরব, নিথর অর্থাৎ কোন জাহাজই রেডিও ব্যবহার করেনা যোগাযোগ রাখার জন্য, কারণ, আগেই বলেছি। তবে এসব জায়গায় কোন জাহাজ আক্রান্ত হ'লে সে সংবাদ রেডিও সাহায্য জানাতে পারে। রেডিওতে শত্রুপক্ষের জাহাজের কোন গন্ধ পেলে সে কথাও জানাতে হয়। এ'ভাবে কতকগুলি জাহাজের দেওয়া তথ্য থেকে বিচার করা হয় সমুদ্রের কোন স্থান তখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ঠিক বন্দর ছাড়বার আগে কাপ্তেনের কাছে নির্দ্দিষ্ট পথটির খবর একটা খামে মুড়ে দেওয়া হয় শীলমোহর করে। গভীর সমুদ্রে গিয়ে এই শীলমোহর ভেঙ্গে পথের সন্ধান বার করা হয়।

বেলা আটটায় জাহাজ ধীরে ধীরে ব্রুকলিনের 'পায়ার' ছেড়ে খোলা সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হ'ল। মানহাট্টানের, কোনী দ্বীপের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে এলাম স্বাধীনতা দেবীর কাছে। সকলেই চেয়ে আছে এই অপূর্ব্ব নগরীর দিকে। কে আবার কবে আসবে জানা নাই। বন্দরের বাইরেই হয়তো কে কোথায় জলের তলায় ওঁৎ পেতে আছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে পৃথিবীর এই প্রান্তে যাদের নাবিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাদের কথাই মনে হয় বার বার। এমনি করে আরও কত জাহাজ মিত্র পক্ষের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে এই বন্দর ছেড়েছিল, যুদ্ধাস্ত্র রণক্ষেত্রে আর গিয়ে পৌঁছুতে পারে নাই—নাবিকেরাও মাটির মুখ দেখে নাই।

যতক্ষণ মাটি দেখা গেল, চেয়ে রইলাম। তারপরে ধীরে ধীরে নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ গগনস্পর্শী অট্টালিকা এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং দিগন্তের

অন্তরালে অন্তর্হিত হ'ল। দিক্ চক্রবালে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম অ্যাটলান্টিকের তরঙ্গরাজি বুকের ওপর ক্ষুদ্র শিশু আমাদের এই জাহাজটিকে আবার উন্মত্ত স্নেহভরে চুম্বন দিতে দিতে অস্থির করে তুলল। যাওয়ার সময় পাইলট পুনরায় তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, আমরা নাকি খুবই ভাগ্যবান। পূর্ব্বেকার আক্রমণগুলির কথা তিনি জানতেন।

কয়লার জন্য প্রথম আমাদের যেতে হবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের সেণ্টটমাস দ্বীপে। সমুদ্রের ওপর দ্বিতীয় আর কোন জাহাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা। কোন ধরনের যুদ্ধ পোতও না। আকাশে উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রের ওপর আমেরিকার দু'একখানা বিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি কোথাও কোন সাবমেরিনের চিহ্ন দেখতে পায়।

ঘণ্টা পাঁচেক বাদে আর বিমানও নেই। গভীর সমুদ্রে এসে পড়েছি। জাহাজ কোন পথে যাচ্ছে জানতে পাশে চার্ট রুমে গেলাম—নিউইয়র্ক থেকে সোজা ডানদিকে পূর্ব্বমুখে প্রায় ৪০০ মাইল গিয়ে তারপর সেখান থেকে ঘুরে দ্বিতীয় একটি সরল রেখায় সেণ্টটমাস। অর্থাৎ নিউইয়র্ক-সেণ্টটমাসের ওপর টানা একটি সরল রেখাকে ভিত্তি করে বহিঃ সমুদ্রে একটি ত্রিভূজ আঁকলে, ত্রিভুজের অপর দুই বাহু ধরে আমাদের যেতে হবে। সেই দুই বাহুই নৌ কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট আমাদের গোপন পথ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ত্রিভুজের ভিত্তির কাছাকাছি জলরাশি বিশেষ বিপজ্জনক। সোজা পথে না গিয়ে তাই এই বন্দোবস্ত।

রাত প্রায় আটটায় প্রথম এস্ ও এস্ পেলাম। সেই মুহূর্ত্তে পশ্চিম অ্যাটলান্টিকে একখানা জাহাজের ওপর সাবমেরিন আক্রমণ হচ্ছে, টর্পিডো জাহাজটিকে আঘাত করেছে। ব্রহ্মাণ্ডের ইথার তরঙ্গ উদ্বেলিত করে সমুদ্র বক্ষে কতগুলো নিরুপায় লোকের সাহায্যের জন্য আর্ত্তনাদ, এস্ ও এস্। হিসেব ক'রে দেখা গেল, আক্রমণ স্থান আমাদের কাছ

থেকে বহু দূরে, প্রায় মেক্সিকো উপসাগরের কাছে। যে পথে চলছিলাম আমরা, সেই পথেই চলতে লাগলাম।

জাহাজটি ব্রেজিলের। এ যুদ্ধে ব্রেজিল নিরপেক্ষ। তবুও নাৎসী সাবমেরিন তাকে আক্রমণ করেছে। বোধ হয় তাদের মতে, জাহাজটি যখন আমেরিকাগামী তখন নিশ্চয়ই আমেরিকার জন্য মালও বহন করছে। মানুষের ব্যবহারোপযোগী যে কোন জিনিষই এ যুদ্ধে সমরোপকরণ তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে। খাদ্যদ্রব্যেরও পরিত্রাণ নাই। নেপোলিয়ন অনুসৃত নীতির ফলে ইংল্যাণ্ডে খাদ্যদ্রব্য যেতে না পারায় সেখানে যে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি হয়েছিল, নেপোলিয়ন নিজেই সে সঙ্কট থেকে ইংল্যাণ্ডকে বাঁচান সেখানে খাদ্যসম্ভার যেতে দিয়ে। নতুবা পৃথিবীর ইতিহাস আজ হয়তো অন্যরূপ লেখা হ'ত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে শত্রুর দেশে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, সৃষ্টি করা হ'য়ে উঠেছে রণনীতি।

গভীর নিশীথে, রাত প্রায় দুটোর সময় দ্বিতীয় আর্ত্তনাদ আর একটি জাহাজ থেকে। সে'ও উপকূলের কাছে, আমেরিকার জাহাজ। দু'খানাই নিশ্চয় আমেরিকার বন্দর অভিমুখী। নতুবা উপকূলবর্ত্তী সমুদ্র পথে যাচ্ছে কেন? বোধ হয় পূর্ব্বে উপকূল দিয়ে যাবার নির্দ্দেশ পেয়ে এরা বেড়িয়েছিলো, এর মধ্যে সে পথ হয়ে উঠেছে নাৎসী সাবমেরিনদের বিহারস্থল। আমেরিকার বন্দরে না পৌছান পর্য্যন্ত নতুন পথের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রও হ'য়ে উঠেছে নরক। ভোর প্রায় পাঁচটার সময় ওখান থেকেও পেলাম সেই আর্ত্তনাদ।

সারা দিন অপেক্ষায় আছি, আবার কোথায় কে ডাকে। যার সঙ্গে দেখা হয় কাজের ফাঁকে এক প্রশ্ন, কাছাকাছি সাবমেরিন আছে কি? না, সেদিনটা নিরুপদ্রবেই গেল, রাত্রিও। আমেরিকার উপকূল থেকে বহুদূরে এসে পড়েছি, প্রায় তিনশ মাইল পূবে। পথটা তবে

নাৎসীরা ধরতে পারে নি এখনও। রাত্রে হাসাহাসি করছিলাম, নতুন দ্বিতীয় অফিসারের একটা উক্তি নিয়ে। অন্ধকারে আমার কাজের ফাঁকে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে এই সব কথাই হচ্ছে, চীফও এসে যোগ দিয়েছে, দ্বিতীয় অফিসার বলে উঠল, দেখ না, এই অন্ধকারে আমরা কত সঙ্গোপনে যাচ্ছি, ঠিক যেন চোর!

বেলা প্রায় দেড়টায় আবার, আমাদের রক্ষা কর, টর্পিডোতে জাহাজ মারা পড়েছে—আর এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। মানচিত্রের ওপর প্যারাল্যাল রুল বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি নির্দ্ধারিত হ'ল আমাদের কাছ থেকে কতদূরে, কোন দিকে। প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে! আবার এ দিকটাতেও স্থরু হয়েছে! কে কাকে বাঁচাবে? নৌ কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ, কাছাকাছি বিপদ ঘটলে অন্য কোন সমুদ্রবিহারীর সেখান থেকে দূরে যেতে হবে। তাদের ভাবনা আমাদের ভাবতে হবে না, আমাদের চিন্তাও কাউকে করতে হবে না! আজিকার দিনে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য যুদ্ধসম্ভার স্থলের রণক্ষেত্রগুলির জন্য নিয়ে চলেছি, সাধ করে একে শত্রুমুখে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রতি রণাঙ্গনে পরাজয়ের কালিমা বহন করতে হচ্ছে এই নব যুদ্ধ সম্ভারের অভাবে। যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে চলতে হবে এগুলোকে। খালি হাতে প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে যুদ্ধ, সেটা ভারতবাসীই করুক! এদের প্রয়োজন অস্ত্র, আরও অস্ত্র।

সাবমেরিনগুলি এখন কেবল টর্পিডোই নয়, শক্তিশালী কামানও ব্যবহার করছে। হতভাগ্য যদি কেউ সমুদ্রে প'ড়ে কিছুকাল বেঁচে থাকে, ভাগ্যে থাক্‌লে তাদের রক্ষা করবে রণতরী বা বিমান যদি কাছাকাছি থাকে। না হলে······

জাহাজের গতিমুখ ঘুরে গেল। একটু আগে বা এইমাত্র যেখানে বিপদ ঘটেছে অন্য কারো, সেখান থেকে দূরে যাচ্ছি পরিপূর্ণ গতিতে।

ভোরের দিকে কাপ্তেন জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিতীয় কোনও সংবাদ পাওয়া গেছে নাকি ?

দুপুরে আমরা মোড় ফিরলাম দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, সেণ্টটমাসে যাবার ত্রিভুজের দ্বিতীয় বাহু ধরে। কাল রাতে একটু অন্য দিকে ঘুরে এখন পর্য্যন্ত সে পথেই চলতে থাকায় এই দ্বিতীয় বাহুটি আর একটু দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেছে।

আরো দুদিন কাটল। নিরামিষ নয়; সাবমেরিন আক্রমণের খবর অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সবগুলিই ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে, আমাদের কাছ থেকে দূরেই।

আশ্চর্য্য ! একখানা রণতরী দেখলাম না বহু কথিত আমেরিকান নৌ বহরের। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে জলদৈত্যগুলি সমুদ্রবিহার কর্চ্ছে, পশ্চিম অ্যাটলাণ্টিকে আমেরিকার ও বৃটেনের নৌ কেন্দ্রগুলির সামনে। প্রতি ত্রিশ মিনিট অন্তর রেডিও বিভাগকে পাশের চার্ট রুম থেকে দেওয়া হচ্ছে জাহাজের তৎকালীন স্থিতি—দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষাংশের সংযোগ স্থল। চূড়ান্ত মূহুর্ত্ত যদি এসেই পড়ে, যেন সময় থাকতে স'রে যেতে পারে সে স্থান অভিমুখী অন্য জাহাজগুলি।

আকাশ পরিষ্কার। দূরে একখানি বিমান দেখা গেল, যুক্ত রাষ্ট্রের রণতরী বিভাগের। আমাদের কাছে এসে আলোর সাহায্যে মর্সের সঙ্কেত প্রণালীতে জানতে চাইল, নিমজ্জিত কোন জাহাজের কোন নাবিক আমরা পথে পেয়ে তুলেছি না কি ?

ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, পশ্চিম অ্যাটলাণ্টিক, মধ্য অ্যাটলাণ্টিক, নাৎসী সাবমেরিনে ছেয়ে গেছে। এতদূরে, জার্ম্মানীর সাবমেরিন ঘাঁটিগুলি থেকে বহু হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এসে এরা কেমন করে সমান ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, বিস্ময়ের বিষয়।

কোথায় পাচ্ছে এরা তেল, জল, আহার্য্য প্রভৃতি ? কে দিচ্ছে ? মিত্র শিবিরে বহু প্রকারের সম্ভাবনার আলোচনা হয়। মেক্সিকোর উপকূলবর্ত্তী ঘন জঙ্গলগুলিতে নাৎসী অর্থে পুষ্ট সে দেশের ষড়যন্ত্রকারীরা বোধ হয় এ কাজ কর্চ্ছে! দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নাৎসী সহানুভূতিশীল কেউ কোন বন্দরে সাবমেরিনগুলির জন্য কোন বন্দোবস্ত করেছে কি না, কে জানে ? ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা এদের সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থির সিদ্ধান্তে মিত্র পক্ষ আসতে পাচ্ছিল না। সে তথ্যের সন্ধান পাই বন্দী হ'য়ে।

নাৎসী রেডিও রোম থেকে, বার্লিন থেকে, ক্রমাগত উপহাস করে চলেছে, বলছে, আমেরিকানরা তাদের কারখানাগুলিতে প্রভূত পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করবার ক্ষমতা রাখে জানি, কিন্তু সেগুলো তৈরী হচ্ছে সমুদ্রগর্ভে যাবার জন্যই! পৃথিবীর কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আস্‌তে হচ্ছে না!

তৎসঙ্গে ব্যঙ্গের ধার বাড়িয়ে বল্‌ছে, আমেরিকা প্রস্তুত করবে, আমরা ধ্বংশ করবো। যে অর্থে, যে পরিশ্রমে একটি জাহাজ ও ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান, গুলি, তৈরী হবে, তার সহস্রভাগ কম অর্থে, পরিশ্রমে, একটি টর্পিডো, গোটা কয়েক গোলা, সেগুলির অকাল পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাবে। কারাখানাগুলি থেকে বেরুতে লাগবে যেগুলির চার মাস বা ছ' মাস, পাঁচ মিনিটেই সাবমেরিনগুলি তাদের অতলে পাঠাবে।

হিটলার নিজে আমেরিকানদের সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে বলেছিলেন, আমেরিকান্ প্লে-বয়রা অর্থাৎ আমেরিকার বাবুর দল শিল্পী ভাল, কিন্তু যুদ্ধের কি জানে ?

আমেরিকার বৃহৎ শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে জার্ম্মানীর ধ্বংশাত্মিকা শক্তির ঘোর প্রতিযোগিতা। শেষোক্ত শক্তিই যেন বিজয়ী

হচ্ছে! দিবা রাত্রিতে এত জাহাজ ডুবছে, কি লাভ এদের সমুদ্রে পাঠাবার, সবাই ভাবি।

সেণ্টটমাস পৌছে দেখি, তিনখানা ক্রুজার রয়েছে নৌ ঘাঁটিতে। ঝকঝকে তকতকে অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত! সকলের মুখে এক কথা, এই যে কত জাহাজ, কত নাবিক মারা পড়ল নিতান্ত অসহায়ের মত এই ক'দিনের মধ্যে, এক দিনও তো দেখিনি এদের কাউকেই বিপজ্জনক সমুদ্রের কোন অংশে। সমুদ্রগুলো যেন একেবারেই নাৎসী অধিকারে চলে গিয়েছে। ছোট এই দ্বীপটির একটি কাফেতে ব'সে অন্য একটি ইংরাজ জাহাজের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে এই সব কথা হচ্ছিল।

ভূমধ্য সাগরে ঘরের কাছে ইতালীয় নৌ বহরের কাপুরুষতায় নাবিক মহলে বিদ্রূপ ক'রে বলা হ'ত, স্কচেরা ভালবাসে হুইস্কি, জার্মানরা বিয়ার, আর ইতালিয়ানদের প্রীতির বস্তু পোর্ট! অর্থাৎ যুদ্ধ এড়িয়ে এরা বন্দরের নিরাপদ আশ্রয় পছন্দ করে বেশী! তবে কি ইতালীর পোর্ট প্রীতি আমেরিকাতেও সংক্রামিত হ'ল না কি! সেণ্টটমাসের ক্রুজার-গুলি তখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল রণতরী নয়, আমেরিকানদের লোক দেখান এক বিলাস সামগ্রী।

সেণ্টটমাস থেকে দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকের মাঝামাঝি পথ ধ'রে সোজা আমাদের কেপ টাউন যাবার কথা। সে রাস্তাতেও সেই একই নাৎসী আক্রমণ, আর নাৎসী আক্রমণ। দিন চার পরে এসব খবর আর তত পাচ্ছি না, দক্ষিণ অ্যাটলান্টিকে এসে গিয়েছি। চীফ ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ ব'লে বসলেন কয়লা নিতে হবে পারনামবুকো (ব্রেজিল) থেকে। তাই, যেতে হ'ল সেখানে।

যুদ্ধের আবহাওয়ার অনেকটা বাইরে, আবার সেই সহজ সাবলীল শ্যামাঙ্গ মানুষগুলি, বন্দরের সীমানা থেকে দূরে, খোলা প্রান্তরে ছোট ছোট

কুঁড়েগুলি। ছোট প্যাণ্টে কোন ভাবে লজ্জা নিবারণ করে নগ্নদেহ, নগ্নপদ, বালকেরা গ্রীষ্মে জল ক্রীড়া করছে জাহাজের চারদিকে। জলের নীচে টাকা পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে বলছে, ওরা বাহাদুরী দেখায় সেগুলি তুলে এবং এই তামাসা দেখিয়ে আমাদের আনন্দ দেবার পারিশ্রমিকস্বরূপ আত্মসাৎ করে!

এখানেও দেখি একখানা আমেরিকান ক্রুজার দু'দিন ধরে আছে। বড়র সঙ্গে বড়র যুদ্ধে ছোটর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব। নতুবা, নিরপেক্ষ দেশের বন্দরে যুধ্যমান জাতিগুলির কোন পক্ষের রণতরী আশ্রয় দেওয়া আন্তর্জ্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু মন্‌রো ডক্‌ট্রিন তো আছেই, নাৎসী ও জাপানীদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে আর একটি নতুন জিনিষ সৃষ্টি হয়েছে সেখানকার রাষ্ট্র বিভাগ থেকে কর্ডেল হাল্‌-এর 'হেমিসফেরিক ডিফেন্স' নীতি বা গোটা আমেরিকা মহাদেশটিকে, সোজা কথায়, তাদের প্রয়োজনে অ্যাক্সিস শক্তিগুলির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার নীতি। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, নাৎসী প্রভাব যদি কোথাও থাকে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে, উচ্ছেদ করতে হবে। এমন কথাও বলা হ'ল, পশ্চিম আফ্রিকার 'ডাকার' থেকে নাৎসীরা সহজেই ব্রেজিলে এসে চেপে বসতে পারে এবং কিছুকাল পরে সেখানে একটি নিখুঁত সমর ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে শেষে যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ে সহজেই অগ্রসর হ'তে পারে। বার্লিন অবশ্য বল্‌ল, ঠিক তা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে নাৎসী আক্রমণের জুজুর ভয় দেখিয়ে কার্য্যতঃ প্রতিবেশী দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলিকে হাতের মুঠোর ভেতর এনে এদের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ সব নিজেদের যুদ্ধ কাজে লাগান!

ব্রেজিল সহজেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের মধ্যে এসে গিয়েছে, তাই বুঝি ব্রেজিলের জাহাজগুলি ডোবান হচ্ছে। ব্রেজিলও একটু পরে এইসব ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল নাৎসীদের বিরুদ্ধে!

দক্ষিণ আমেরিকার সব রাষ্ট্রই যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লী মানতে প্রস্তুত নয়। ক্ষুদ্র চিলি ধানি লঙ্কা, বলে, নিজের দেশের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে সে নিজেই বুঝবে, সাম খুড়োর অভিভাবকত্বর দরকার নাই। আরো কতকগুলি রাষ্ট্রেরও সেই মনোভাব। পরিষ্কার বলছিলোও সে কথা।

কিন্তু আমেরিকার ক্রুজার এখানে কি কচ্ছে ? আমেরিকার নগরী-গুলিতে দেখেছি সুচারু ক'রে রাস্তা, ঘাট, গৃহ, সব সাজাবার প্রয়াস। যেন নেহাৎ নিউইয়র্ক-এর 'ব্রডওয়েতে' রাখা সম্ভব নয় ব'লে সমুদ্রের ব্রডওয়ে সুশোভিত করতে পাঠান হয়েছে। ব্রেজিলের বন্দরে ও সেণ্ট টমাসে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে !

কোন জাতির, কোন নাবিকেরই সেদিন আমেরিকার রণতরী বহরের ওপর শ্রদ্ধা ছিল না—ওয়াসিংটন থেকে কিছু বলা হ'লেই সবাই বলত, 'ইয়াঙ্কি ব্লাফ' বা আমাদের 'কলকাতার চাল !'

দু'বৎসর পর, আবার এই আমেরিকাই হ'ল সকলের বিস্ময় ! উপযুক্ত ব্যবস্থায় ও সুপ্রচুর সমরোপকরণে সজ্জিত সেই 'আমেরিকান বাবু'ই হয়ে উঠল দুর্দ্ধর্ষ ও সাহসী শত্রু ! মানুষগুলি বদলায় নাই—সুচারু ব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক দোষগুণগুলিকে কার্য্যকরী করে তুলেছে। এরই নাম নেতৃত্ব !

২৮শে মার্চ্চ ১৯৪২, ব্রেজিল ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। যত শীঘ্র সম্ভব গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি। ব্রেজিলের উপকূলের কাছে নাৎসীরা অনেকগুলি জাহাজ ধ্বংশ করেছে। ভোর রাতে এস্ ও এস্ পাওয়া গেল, বিপত্তিস্থান সেই ক্যারিবিয়ান সমুদ্র। পেছনে—বহু দূরে আমাদের কাছ থেকে। আপন পথেই যাচ্ছি, পথ বদলাবার কোন প্রয়োজন নাই।

আরো দু'তিন দিন কেটে গেল। পেছনের ঘটনাগুলি ক্রমেই একটা স্মৃতি হয়ে উঠ্ছে—উৎকণ্ঠা দূরে যাচ্ছে। রেডিওর যে তরঙ্গগুলি কেবল

জাহাজগুলির জন্য সমুদ্রে ব্যবহৃত হয় সেগুলো স্থির, নিথর। এতটুকু শব্দ কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কী চমৎকার নীল সমুদ্র, নীল আকাশের নীচে এই উষ্ণ মণ্ডলে। উত্তর অ্যাটলান্টিকের সে উন্মত্ততা নাই, কুয়াশা নাই। বক্ষের শিশুটির এতটুকু আঘাত না লাগে, পরম স্নেহভরে রেখেছে। সমুদ্রের জলে তরঙ্গ নাই—কম্পনের এতটুকু রেখা পর্য্যন্ত নাই। দিবসের গ্রীষ্মে কাজ আছে যাদের, খালিগায়ে বা সামান্য কিছু গায়ে ধীরে সুস্থে কাজ করে, কর্ম্মহীন যারা, নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমায়। সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ সামুদ্রিক বাতাস দিবসের উষ্ণতার ক্লান্তি সযত্নে দূরে ঠেলে দেয়। সমুদ্র দেখি, ওপরে আকাশে কোটি কোটি দীপমালা জ্বলে ওঠে, নীচে প্রশান্ত অচঞ্চল বারিধি বক্ষ। যুদ্ধের কোন কথাই মনে থাকে না। মাটি হ'তে, লোকালয় হ'তে, মানব সমাজের কল্লোল হতে বহু দূরে, কল্লোলহীন এই সমুদ্রে আকাশের গায়ে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল তারাগুলি কি কথা যেন বলে, বুঝেও বুঝে ওঠা যায় না।

ক'মাসের একটানা সাবমেরিন, টর্পিডো, বিমান, বোমা ও সমুদ্রের ক্ষিপ্ততার পর পরম শান্তিপূর্ণ এই প্রশান্ত আবহাওয়ায় সকলেই গা ঢেলে দিয়েছে।

দুশ্চিন্তা দূরে গিয়েছে। লাইফ জ্যাকেট ওয়ার্ডরোবে উঠেছে।

কেপটাউনে পৌছুতে এখনও প্রায় বারদিন বাকী। সেই কথাই হয়, বিচিত্রা আফ্রিকা সব সময়ে চোখের সামনে ভাসে। কেপটাউনে পৌছে দিনগুলো কেমন করে কাটাবে, জল্পনা কল্পনা করে ওরা। আমি ভাবি, আর কতদিন লাগবে ভারতে পৌছুতে। সকলের ইচ্ছা, কেপটাউনে বেশ কিছু দিন, মাসখানেক হলেই ভাল হয়, কোন ছুতো নিয়ে জাহাজ থাকে, আমার ইচ্ছা, যত কম সময়ের মধ্যে ওখান থেকে কলম্বো বা বোম্বে মুখে পাড়ি দেওয়া যায়!

প্রত্যহ দিন গুনি, আর কতদিন আছে। ইংল্যাণ্ডের ওয়ালজেণ্ড থেকে বাড়ীতে কেব্‌ল্‌ করেছিলাম, উত্তর পাইনি, বোধ হয় জবাব আসবার আগেই ইংল্যাণ্ড ছেড়েছিলাম। নিউ-ইয়র্ক থেকে আবার খবর নেবার চেষ্টা করি, তারও ফল হয়নি'। ভারত সম্বন্ধে বিশেষ একটা আশঙ্কা! ব্রহ্মে জাপানী এসে পড়েছে—কলকাতার কি অবস্থা, কে জানে? নৌ-কর্তৃপক্ষের আঁকাবাঁকা কষা পথে, জাহাজের মন্থর গতিতে, বিরক্তি ধ'রে যায়।

ক্যাবিনে বসে নিজের রেডিও'তে শুনি—ডাঙ্গায় কি হচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমেরিকান জীবন প্রণালীর কথা; যুদ্ধের পরে পৃথিবীতে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা; চার্চিলের ইংরাজী ভাবাভাবী জাতিগুলিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর জাতিগুলিকে নিয়ে এক রাষ্ট্রনৈতিক সৌরমণ্ডল গঠনের স্বপ্ন। ইঙ্গ-আমেরিকান সূর্য্য নির্দ্ধারিত কক্ষগুলিতে পৃথিবীর আর সব জাতিকে ঘুরে বেড়াতে হবে যতদিন পৃথিবী আছে এই ধরণের সব কথা শুনলাম। চার্চিল লোকটাকে খুব পছন্দ হয়, সোজাসুজি ইংরাজ জাতির মনের কথাটা খুলে বলে, বিভ্রান্ত করে না। অপরকে সাবধানই করে দেয়। হঠাৎ একদিন শুনি, বি, বি, সি, ডাক্‌ছে 'হ্যালো ইণ্ডিয়া'! বিশ্বাস হ'ল না, আবার ভাল করে কান খাড়া করে রইলাম। আবার 'হ্যালো ইণ্ডিয়া'— সম্পূর্ণ নতুন এ'। বি, বি, সির তালিকায় বরাবর দেখেছি, আমেরিকার জন্য প্রোগ্রাম, দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রোগ্রাম, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের জন্য, কিন্তু ভারতের জন্য একটা বিশেষ প্রোগ্রাম কোনদিন ছিল না। জানি না অন্য ভারতবাসী কেউ এ'তে ক্ষুন্ন হয়েছেন কিনা কখনও, আমি হইনি'। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। জ্ঞাতি জ্ঞাতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখছে। অ-ভারতীয় ম্লেচ্ছ জাতিগুলির সঙ্গে অন্ততঃ আমি তো রক্তের সম্বন্ধ পাতাতে চাই না!

কিন্তু হঠাৎ আজ ভারতকে ডাকছে কেন? চিরকালই দেখেছি, এরা সকল কথায় ভারত ও আফ্রিকাকে বন্ধনীতে উল্লেখ করে। অর্থাৎ কৌশলে ব'লা—আফ্রিকার নিগ্রো ও জগতের শ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতি এক-ই। নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—কোনদিন গ্রাহ্যও করিনি ও সব কথা। কিন্তু হঠাৎ কি হ'ল? উন্মুখ হয়ে রইলাম, কি বলে। মানচিত্র থেকে যাকে একেবারে লুপ্তপ্রায় করা হয়েছে, অকস্মাৎ তারই ওপর এত প্রেম? বক্তা ভারতবাসীকে বোঝাচ্ছেন, পূর্ব্ব দিকের পীতবর্ণের মানুষগুলি যে কী ভীষণ, তাই। ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের বিপদ যে একই, বহু শূন্যগর্ভ শব্দ রচনা করে বোঝাবার চেষ্টা হ'ল। ভারতের ঐতীহ্যের কথা স্মরণ করে বোধ হয় বক্তার দু'চারখানা রুমালই ভিজে গেল। সর্ব্বশেষে পরিষ্কার বলা হ'ল ভারতীয়দের জাপানী আক্রমণ রুদ্ধ করতে!

কথাগুলি যেন কেমন লাগল। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ছেলেবেলায় পড়েছি, ইংরাজের প্রতাপের ভয়েই পৃথিবীর অন্যান্য শ্বাপদ জাতিগুলি ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে পাচ্ছে না! প্রাচীনতা নিবন্ধন ভারত নাবালক হয়ে পড়েছিলো, তাই করুণাময় করুণা করে ইংরাজকে এদেশে পাঠিয়েছেন আমাদের রক্ষা করতে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে। তবে? এ কি শুনছি আজ? বৃদ্ধশিশু ভারতকে ইংল্যাণ্ড বলছে, জাপানীদের হটাতে!

আর একদিন শুনলাম রুজভেল্ট আমন্ত্রণ করেছেন এক ভারতীয় নেতাকে ওয়াসিংটনে ভারত সমস্যা আলোচনা করতে এবং ব্যক্তি ও জাতিবিশেষের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এ সমস্যা সমাধানের আলোচনায়। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির যে কোন সময় আত্মচেতনা ফিরে পাওয়া দস্যুজাতিদের কাছে সমস্যা বটে; কিন্তু আমাদের সেটা কিসের সমস্যা বুঝতে পারলাম না।

আবার শুনছি রুষিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে নাৎসীদের দুর্গতি। নাৎসী-অধিকৃত রুষঅঞ্চলগুলিতে সোভিয়েট গরিলাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী সব। নিউইয়র্কে থাকতে দেখেছি, তখন সদা নিন্দিত ষ্ট্যালিন অকস্মাৎ ওদের কাছে কত প্রশংসার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেমাগুলিতে সোভিয়েট সম্বন্ধে কোন চলচ্চিত্রে এই মৌন মানুষটির আবির্ভাব হ'লেই জনতার কি উৎসাহ, উত্তেজনা ও আনন্দ! ভীতিপ্রদ বিরাট নাৎসী যুদ্ধ যন্ত্রের মাত্র আংশিক চাপে ফ্রান্স ও উত্তর আফ্রিকায় অনেকানেক বৃথা অভিমানী জাতির মধ্যে কারো সম্পূর্ণ পতন ঘটেছে, কেউ দূরে স'রে গিয়েছে; কিন্তু সেই জার্ম্মানদেরই পরিপূর্ণ শক্তিকে এই লোকটির নেতৃত্বে যে জাতি এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতার সঙ্গেই ঠেকিয়ে রাখছে, তাদের প্রশংসার উচ্ছ্বাসের সীমা নাই।

জার্ম্মান অগ্রগতির সম্মুখে রুশিয়রা কি অপূর্ব্ব পদ্ধতিতে সমস্ত শিল্পের কারখানাগুলি পশ্চাতে দ্রুত সরিয়ে ফেলছে, এ সম্বন্ধে বিষদ বর্ণনা। যে ২" কামান বর্ত্তমান যুদ্ধে ফ্রান্সের ও ইউরোপের অন্যান্য রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা থেকে 'স্যাণ্ডহার্ষ্ট' 'উলউইচ'-এ রণনীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত চার্চ্চিলের সমশ্রেণী উদ্ভূত রণপাণ্ডতেরা নেহাৎ অব্যবহার্য্য বলে ধরে নিয়েছিল, সোভিয়েট আবার যুদ্ধক্ষেত্রে তাই ব্যবহার করে চমৎকার ফল পাচ্ছে, সে কথা। তুষারমণ্ডিত রুষ রণক্ষেত্রগুলিতে সোভিয়েট যে নতুন স্কী-এর ওপর ট্যাঙ্ক উদ্ভাবন করে বিস্মিত নাৎসীদের ছিন্নভিন্ন করছে, সে কাহিনী।

অথচ, কিছুদিন পূর্ব্বেও এই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কত কথাই না এরা প্রচার করেছে। এসিয়াটিক রুশ, বর্ব্বর রুশ, বহুভাষাভাষী রুশ এবং নাসা-উত্তোলনকারী-শ্রেণী বিধ্বংশী, ইতর শ্রেণীজাত কতকগুলি রক্ত-লোলুপ অশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা চালিত রুশ সম্বন্ধে কত বিচিত্র, অদ্ভুত

কথাই না প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বিশ্বনিন্দুক কাগজগুলিতে।

১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবে জাত এই নব শিশু আন্তর্জ্জাতিক ও গৃহের লক্ষ বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠে যখন পঞ্চ-বার্ষিকি ব্যবস্থার দ্বারা সমষ্টিগতভাবে দেশকে পুনর্গঠন করতে সুরু করল, আত্মপ্রশংসাশীল ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা একে হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। এসিয়ার রক্ত যাদের শরীরে বইছে, তারা নাকি আবার বিরাটভাবে কোন কিছু করতে পারে কোনদিন!

কিন্তু ঈর্ষার জ্বালাভরা বিদ্রূপে জগন্নাথের রথ থামল না। তাই একদিন অবশেষে 'গ্রিন্‌কো'কে পাঠিয়ে জানতে চাইল, সত্যিই পৃথিবীর আর এক প্রকাণ্ড ভূভাগে ম্যাস প্রডাক্‌সন্‌ হচ্ছে কিনা। যা জানতে পারল, তাতে রুশ বিদ্বেষ বাড়ল বই কমল না।

এই নিদারুণ রুশ-বিদ্বেষের ফলেই হিটলারের উত্থান সম্ভব হয়েছিল, জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদ প্রসারিত হবার সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অতি চতুর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দল ও চক্র বিশেষের সাহায্যেই নাৎসী দলের সৃষ্টি, স্থিতি ও বৃদ্ধি ঘটেছিল।

প্রকৃতির মর্ম্মন্তুদ পরিহাস—সেই ষ্ট্যালিন, সেই সোভিয়েটের গুণগানে পঞ্চমুখ, এদের পূর্ব্বতন ধ্বংশ-কামীরা।

সন্ধ্যায় কখন কখন অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে এ কথা। এই নরমেধ যজ্ঞের জন্য সত্যই দায়ী কে? কাদের নীচতায় ও অর্থলোলুপতায় পৃথিবীর শান্তি বিশ পঁচিশ বৎসর অন্তর অন্তর বিপন্ন হচ্ছে!

রাজনীতিতে ক্লান্তি ধরলে তখন কেউ নিয়ে আসে বেহালাটি, কেউ বাজায় অ্যাকরডিয়ান্‌। তৃতীয় ইঞ্জিনিয়ার সুইডিস ছেলেটির যদি থাকে অবসর এবং আমাদেরও—সেলুনে বসে সুরু হয় যন্ত্রসঙ্গীত চর্চ্চা।

ছয় দিন কাটল। সেদিন আমাদের এই মজলিসের পর নতুন ডেনিস্ ষ্টুয়ার্ডটিকে হঠাৎ কাছে পেয়ে সবার কি খেয়াল হ'ল, ওকে বলা হ'ল, কালকের ডিনারটি—এদেশীয় ইংরাজী রীতিতে লাঞ্চ—যেন একটু ভাল রকমই বন্দোবস্ত করা হয় ; ব্রেজিল থেকে নেয়া মুরগীগুলির রোষ্ট।

৩রা এপ্রিল—আবহাওয়া পূর্ব্বেরই মত। শান্ত সমুদ্র, নীল আকাশ, সুপ্রচুর তৃপ্তিকর প্রাতঃকালীন আহারের পর দু'চারটে আপেল নিয়ে ওপরে ব্রীজে গেলাম তখন যে সেখানে আছে, তার সঙ্গে গল্প করতে। তারপর এ'ল মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। ডিনারের ব্যবস্থা নতুন ষ্টুয়ার্ডটি আজ রীতিমতই ভাল করেছিল।

ভীষণ গরম। প্রাকৃতিক ও মানসিক নিশ্চিন্ত অবস্থা—পরিপাটি মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অলস দেহকে নিদ্রা আচ্ছন্ন ক'রে দিতে চায়। দু'টোর সময় আমার কাজ, একটু শুয়েছি কেবিনের পাখাটি খুলে দিয়ে ; জীবনে তবে নিবিড় আরামও আছে !

* * * * *

টট্-টট্-টট্-টট্—ঘুম ভেঙ্গে গেল। কী ছেলেমানুষি করছে ব্রীজের ওপর মেসিনগান দু'টি নিয়ে। পাশ ফিরে শুলাম। তরলমতি বালকদের হাতে কোন কিছু থাকলে যেমন করে, তেমনি ডিনারের একটু আগেও দ্বিতীয় অফিসার মেসিনগান দু'টো নিয়ে খেলা করছিল।

টট্-টট্-টট্-টট্—একটা কাঠের ছোট্ট টুকরো ছিট্‌কে এসে বিছানায় পড়ল। চিমনীর দিকের জানালাটা খোলাই আছে এই গরমে—খুব নীচু হ'য়ে একটি বিমান সেখান দিয়ে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। স্পষ্ট দেখি, বিমানটির ল্যাজে লেখা, ইউ, এস্, নেভি। বিছানায়

উঠে বসেছি, মাথার কাছে কাপ্তেনের এবং আমার ঘরের মধ্যবর্ত্তী কাঠের দেয়ালটায় এক ইঞ্চি মতন একটা ফুটো!

টট্-টট্-টট্-টট্—তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলেছি ওয়ার্ড-রোব্ থেকে লাইফ জ্যাকেটটি নিয়ে গায়ে প'রে, ওপরে—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম বিপদ-জ্ঞাপক সঙ্কেত বেজে উঠল জাহাজে। আবার—গুড়ুম, গুড়ুম,—এবার মাথার ওপর মনে হচ্ছে, ছুটে গিয়ে ব্রীজের ওপর দেখি কেউ নেই। ভাঙ্গা কাঁচ, কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। চার্টরুম ও রেডিও রুমের গায়ে প্রায় এক ফুট উঁচু করে পিচ্ ও ছোট ছোট পাথরের টুকরো লাগিয়ে এ জায়গাটিকে গুলি ও স্প্রাপনেলের আঘাত সহনশীল করা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে থাকতে। সবাই বোধ হয় ভেতরেই গেছে।

রেডিও-রুমে তখন তৃতীয় রেডিও-অফিসারের পালা চলছিল। ঘরের দরজাটা কোথায় উড়ে গেছে, ডান দিকের দেয়ালও খানিকটা। ভেতরে ঢুকে দেখি রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। মেজের সঙ্গে আঁটা টেবিলের গা ঘেঁষে লাগান চেয়ারটিতে একটি লোক বসে আছে—মাথাটি যেন ক্ষুরের মত ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে কেউ কেটে ফেলেছে এই মাত্র! সামনে দেয়াল, টেবিল, যন্ত্রপাতি রক্তে মাখামাখি। তখনও ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। পাশের চার্টরুমে ইতিমধ্যে কাপ্তেন এসে গেছেন, জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের আক্রমণ? কাপ্তেন বললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখনও, বোধ হয় 'রেইডার'। ইতিমধ্যে দেখি, বেতারের এরিয়েল ছিন্ন হয়েছে। এমার্জ্জেন্সি এরিয়েলের সাহায্যে সবে ইথার তরঙ্গ স্পন্দিত হয়েছে, আবার গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম। ওরা চায়না কোন খবর আমরা পাঠাতে পারি। আমি এখনও অনাহত। একটা সংবাদ পাঠান হ'ল সকলের উদ্দেশ্যে, ১৭° ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা ও ১৮° ডিগ্রী দক্ষিণ

অক্ষাংশের সংযোগ স্থলে 'আউষ্টে'র ওপর প্রবল আক্রমণ চলছে, বিমানের ও অজ্ঞাত রণতরীর।

জাহাজ একেবারে থেমে গিয়েছে। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ। ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে দূরবীন লাগিয়ে সবাই দেখছি কে কোথা থেকে আক্রমণ করছে। জাহাজের হতাহতদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। জীবনতরীগুলি নামাবার ব্যবস্থা হবে, হঠাৎ আমাদের জাহাজের কামানটা একবার গর্জ্জে উঠল। কাপ্তেনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ওদিককার গান ক্রু অদৃশ্য শত্রুর ওপর গোলা ছুঁড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারার মত স্রাপনেল গোলা এসে জাহাজের ওপর ও কাছাকাছি জায়গায় ফাটতে লাগল। আড়াল নেবার জায়গা নাই। গোলার বিস্ফোরণগুলির মধ্যবর্ত্তী সময়গুলিতে আহতদের করুন তীব্র আর্ত্তনাদ। অকস্মাৎ জাহাজের ওপর একসঙ্গে অনেকগুলি বিস্ফোরণ! — আগুন! আগুন! আগুন! ডেকের ওপরকার তেলের পিপেগুলির ওপর গোলা বিস্ফোরিত হয়েছিল, এখন প্রচণ্ড শব্দ করে সেগুলো ফাটছে। জ্বলন্ত তেল সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, কিছু দেখা যায় না, বিস্ফোরণ, আগুন আর ধোঁয়া। প্রচণ্ড উত্তাপে গা ঝলসে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে অন্য কোন গগনচারী জ্যোতিষ্কের ধাক্কা লেগে গেল, সৃষ্টি রসাতলে দিয়ে লক্ষ কামান একসঙ্গে গর্জ্জন করল।

বিস্ময় কাটলে দেখি, সমুদ্রের ওপর ভাসছি। নিকটেই সমুদ্র ধূ ধূ করে জ্বলছে।
